দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হলো ভারত

— পৃঃ ২৬

নতুন মাইলফলক অতিক্রম করল ভারতীয় অর্থনীতি

— পৃঃ ৩৮

৭৭ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ১৬ জুন, ২০২৫।। ১ আষাঢ়, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

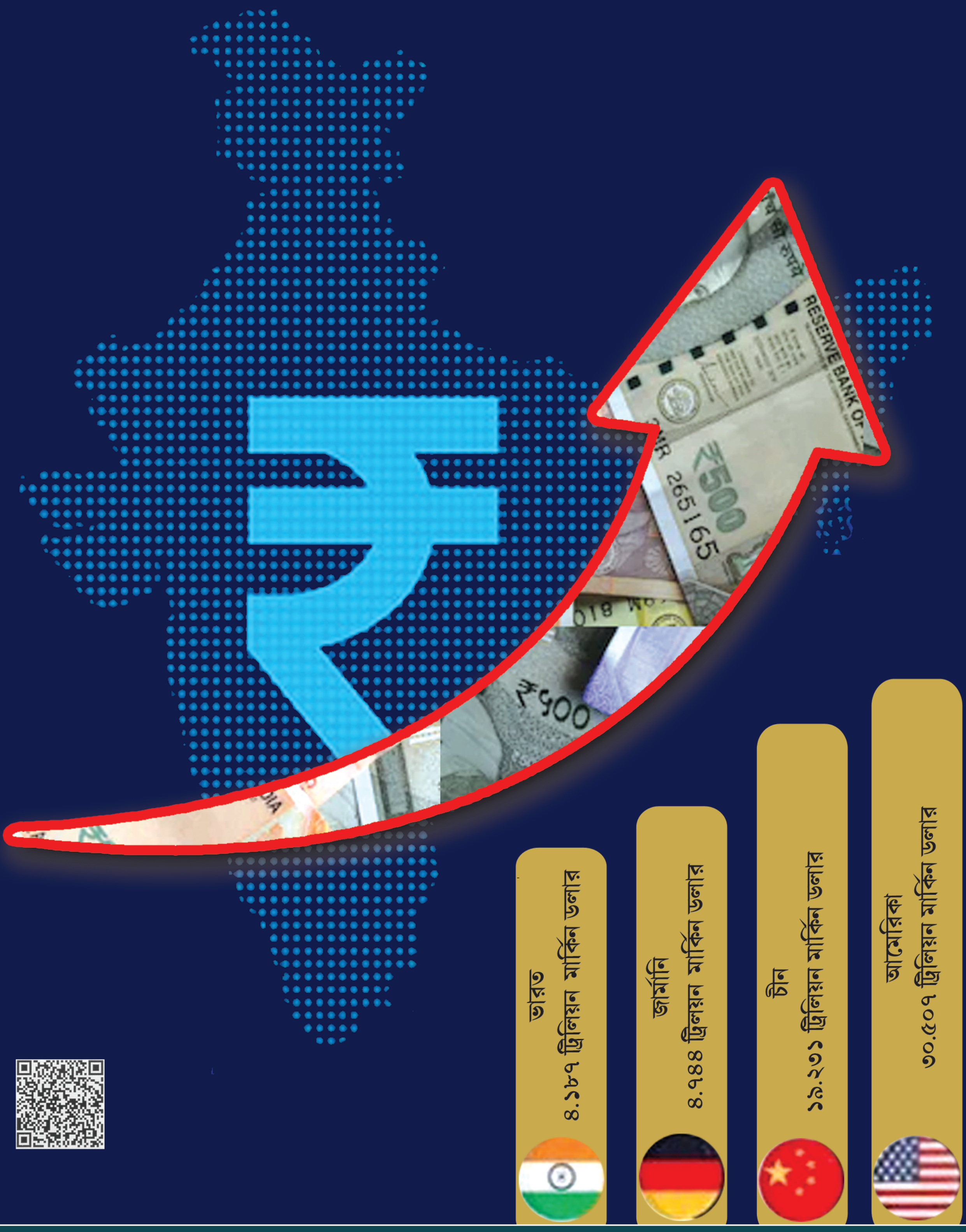

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ১ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৬ জুন - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

দাগি ও দুর্নীতিপরায়ণরা কি পশ্চিমবঙ্গের ভবিতব্য?

দারোগার চেয়ে দেখি চৌকিদারের হাঁক বেশি

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

মেয়াদ উত্তীর্ণ অনুদাদা দিদির ডাস্টবিনে ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

সন্ত্রাসবাদ কী করে ধ্বংস করতে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছে ভারত

☐ রাজনাথ সিংহ ☐ ৮

বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার অপরিহার্য ও জরুরি ☐ কৌটিল্য ☐ ১০

ভারতবাসীর আশা পূরণে বদ্ধপরিকর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার

☐ সুদীপ্ত গুহ ☐ ১১

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখবে ভারত

☐ তারক সাহা ☐ ১৩

চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশের সম্মিলিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে ভারতকে ☐ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ☐ ১৪

প্রধানমন্ত্রীকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করা একজন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে শোভনীয় নয় ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ১৫

যশোরের অভয়নগরে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ কীসের ইঙ্গিত?

☐ ১৭

শুধু বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি নয়, আজ বিশ্ববন্ধু ভারত

☐ অরবিন্দ ভট্টাচার্য ☐ ২৩

জাপানকে টপকে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির তালিকায় চারে ঠাঁই করে নিল ভারত ☐ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ☐ ২৪

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হলো ভারত

☐ ড. রামানুজ গোস্বামী ☐ ২৬

ঋষি উদ্ভাবিত এক অভিনব পন্থা : যোগবিজ্ঞান

☐ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ☐ ৩১

সুস্থ শরীর-মনের জন্য যোগাভ্যাস জরুরি

☐ প্রদীপ মারিক ☐ ৩৪

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি আজ ভারত

☐ কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য ☐ ৩৫

নতুন মাইলফলক অতিক্রম করল ভারতীয় অর্থনীতি

☐ অর্ণব কুমার দে ☐ ৩৮

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ☐ দীপক খাঁ ☐ ৪৩

এক নির্মম প্রশ্নের মুখোমুখি পশ্চিমবঙ্গ

☐ বিপ্লব বিকাশ ☐ ৪৬

বাংলাদেশের পুতুল সরকার আসলে চাইছে কী?

☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ৪৭

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে অপপ্রচার থেকে বিরত থাকুন রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা ☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ৪৮

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতের বাস্তবসম্মত কৌশল

☐ ড. নন্দিনী বশিষ্ঠ ☐ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২৩ জুন
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৩ জুন
২০২৫

সুশাসনের এগারো বছর

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী পরিচালিত ভারত সরকারের ১১ বছর পূর্ণ হলো। সেই সঙ্গে এই সরকার তার তৃতীয় দফার প্রথম বছর পূর্ণ করলো। এগারো বছরের শাসনকালে এই সরকারের সাফল্য বিশ্বমঞ্চে প্রশংসিত হচ্ছে। দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দেশের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা যেভাবে বাস্তবে রূপায়িত করেছে তা প্রশংসাযোগ্য।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ভারত সরকারের বহুমুখী উন্নয়নের বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি

ইতিহাস সাক্ষী থাকিয়াছে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে সমগ্র বিশ্ব। 'পরিকল্পনা কমিশন' যুগের অবসানের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারতের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা হইল 'নীতি আয়োগ'। গত ২৪ মে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত তাহাদের পরিচালন পর্ষদের দশম বৈঠকে নীতি আয়োগের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম ঘোষণা করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী সম্প্রতি জাপানকে অতিক্রমপূর্বক বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইয়াছে ভারত। মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র নিরিখে এবং অর্থমূল্যের বিচারে বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতির বহর দাঁড়াইয়াছে ৪.১৮৭ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক দশক পূর্বে, ২০১৪ সালে ১.৮৬ লক্ষ কোটি ডলার জিডিপি-সম্পন্ন দেশ ভারত ছিল বিশ্বের দশম বৃহত্তম অর্থনীতি। এক দশক যাবৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশলী পরিচালনায় চালিত হইতেছে ভারত এবং ভারতীয় অর্থনীতি। তাঁহার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রমে সক্ষম হইয়াছে দেশ। ভারতের এই সাম্প্রতিক সাফল্য জনমানসে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিয়াছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' নির্মাণে সংকল্পবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার।

কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ (শক্তিক্ষেত্র), পরিকাঠামো, পরিবহণ, তথ্য-প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গবেষণা, মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, পরিষেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করিতেছে চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির সাম্প্রতিক শিরোপা। জিডিপি-র বিচারে গত এক দশকে ভারতীয় অর্থনীতি সর্বমোট বৃদ্ধি পাইয়াছে ১২৫ শতাংশ। ২০১৫ সালে ভারতের জিডিপি ছিল ২.১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২৫ সালে আসিয়া ভারতের জিডিপি দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের প্রতিবেদনে প্রকাশ, বিগত বৎসরসমূহের ন্যায় আগামীদিনে বার্ষিক আর্থিক বৃদ্ধির এই উচ্চহার অব্যাহত থাকিলে ২০২৮ সালে জার্মানিকে অতিক্রমপূর্বক ৫.৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার জিডিপি-সম্পন্ন হইয়া বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে ভারত। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি-র পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। বর্তমানে ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইল প্রায় ২,৯০০ মার্কিন ডলার। ২০৩০ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪,৫০০ মার্কিন ডলারে পৌঁছাইবে বলিয়াও বহু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্বব্যাপী তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এক বৃহত্তর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে বর্তমান ভারত। ইন্টারনেট (অন্তর্জাল) পরিষেবা ও মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক বা দূরভাষ ব্যবস্থা দেশব্যাপী প্রসারিত হইবার দরুন এক্সপোনেন্সিয়াল হারে চলিতেছে তথ্য উৎপাদন বা ডেটা জেনারেশন। এক বিপুল তথ্যভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া উঠিতেছে ভারত, যাহা তাহার অন্যতম 'স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেট' বা কৌশলগত সম্পদ। প্রযুক্তিগত উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকরী হইতে চলিয়াছে এই বৃহৎ তথ্যভাণ্ডার। এর সুরক্ষা বিধান বিশেষ প্রয়োজন। কোনো বৃহৎ শক্তি যাহাতে তথ্যের নাগাল না পায়, তাহা সুনিশ্চিত করা আবশ্যক।

শিল্পোন্নতির সঙ্গে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষার সমন্বয়ে সুষম উন্নয়ন প্রয়োজন। উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের মাধ্যম হইতে পারে গবেষণাক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বদানপূর্বক দেশের 'স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম'টিকে অত্যুন্নত করিয়া তোলা সম্ভব। ভারত নবীন প্রজন্মের দেশ। 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট' বা দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হইলে আগামীদিনে এক উন্নত ও অত্যাধুনিক ভারত গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে নবীন প্রজন্ম। একই সঙ্গে গ্রামীণ ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কার-সহ প্রয়োজন প্রযুক্তির প্রয়োগ। জৈব কৃষির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত সরকার ও দেশবাসীর। তাহলে খাদ্য হইবে বিষমুক্ত ও নির্মল, রক্ষা পাইবে গোসম্পদ। কৃষকস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকতর হারে বিনিয়োগও প্রয়োজন। কৃষি, শিল্প, পরিষেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইলে স্বাভাবিক নিয়মে দেশের মাথাপিছু আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রক্রিয়ায় ক্রমোন্নতির রেখচিত্রে সওয়ার হইয়া 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রগতি অব্যাহত রাখিবে নূতন ভারত।

সুভাষিতম্

আর্যকর্মাণি রজ্যন্তে ভূতিকর্মাণি কুর্বতে।
হিতং চ নাভ্যসূয়ন্তি পণ্ডিতা ভরতর্ষভ।।

জ্ঞানীজন শ্রেষ্ঠ কাজ সম্পাদন করে থাকেন। রাষ্ট্রের উন্নতির লক্ষ্যে তাঁরা কল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হয়ে থাকেন। তাঁরা তাঁদের হিতৈষী বা মিত্রদের দোষ-ত্রুটি বিচার করেন না।

দাগি ও দুর্নীতিপরায়ণরা কি পশ্চিমবঙ্গের ভবিতব্য?

দারোগার চেয়ে দেখি চৌকিদারের হাঁক বেশি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সানাইটা না গর্জে যত, তর্জে তত পোঁয়ের দল। বালুচরে দাঁড়িয়ে বলে 'হ্যাঁ, এখানে হাঁটু জল'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সানাইয়ের তুলনায় বীরভূমের কেষ্ট মণ্ডলের পোঁ এখন জোরে বাজছে। এই লেখায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহুবচনে ব্যবহার করছি। কারণ পশ্চিমবঙ্গে অন্যায় ও অবিচার বহুমুখী হয়ে উঠেছে। সূর্য থেকে বালুর তাপ যে অধিক হতে পারে, গোরু পাচারকারী অনুব্রতদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড় করালে তাই মনে হবে। আট মাস আগে তিহার জেল থেকে অনুব্রত ছাড়া পায়। রাজ্য বিধানসভা ভোটের ন'মাস আগে তার খেলা শুরু হয়েছে। বীরভূমের ১১টি আসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কোহিনুরের মতো। হিন্দু ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিজেপি যে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তা মোটেই সুখকর নয়। কন্যা অভয়ার বিচার গুলিয়ে দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশি বামকে ব্যবহার করেছিল। ওরা এখন ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য। তবে অনুব্রতর মতো দাগিদের শায়েস্তা করা সহজ নয়। অনুব্রত মুখ খুললে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোশ খসে যাবে। না হলে পুলিশকে গালিগালাজ করে অনুব্রত রেহাই পেত না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের দাবিদাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে ব্যস্ত। সেই সঙ্গে রয়েছে জুলাইয়ের দলীয় নাটুকেপনা। কবিয়াল হরু ঠাকুরের লেখা আর শিষ্য ভোলা ময়রার গান দিয়েই তাই শুরু করেছিলাম। আগেই লিখেছি '৬০ ও '৭০-এর দশকে কীভাবে দুষ্কৃতীদের পারিবারিক সদস্য বানিয়ে যুব কংগ্রেস নেতারা রাজ্য রাজনীতিতে তাদের স্থান করে দিয়েছিল। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সমাজবিরোধী ব্যবহার করেই রাজ্য থেকে নকশাল ভূত তাড়িয়েছিলেন। পুলিশ কেবল সঙ্গ দিয়েছিল। বিদেশি বামেরা ক্ষমতায় এসে সমাজবিরোধী পালটে পুলিশকে সামনে নিয়ে আসে। বাম জমানার পুলিশের চর এখন তৃণমূলের বড়ো নেতা। রাজ্য চালায়। ও ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা ব্যতিক্রম নয়। তৃণমূল আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের দুর্নীতি যে সমার্থক তিনবার তার উলটো প্রমাণ দিয়েছে এই রাজ্যের অর্ধেকের মতো ভোটার। তথাকথিত সংখ্যালঘু, মুসলমান সম্প্রদায় রয়েছে তার প্রথম সারিতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সানাইয়ের পোঁ-রা অনেক বাস্তবকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন তাদের মসিহা। তাই বহুমুখীভাবে দুর্নীতিপরায়ণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের জন্ম হয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অনুব্রতরা কেবল উপসর্গ আর রোগটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়— এই ধারণা নিয়ে আমি দ্বিমত। আমার কাছে দু'জনেই উপসর্গ ও রোগ। একে অন্যের উপর নির্ভর করে। ফলে উপসর্গ থেকে রোগকে বিচ্ছিন্ন করা বোকামি।

পুলিশের চর যদি পুলিশকে চালায় তাহলে দারোগার থেকে চৌকিদারের হাঁক বেশি হবেই। বাম জমানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান শত্রু ছিল তার নিজের দল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট সরকারের অধীনস্থ পুলিশ। সিপিএম-এর মুখোশ না থাকায় তাকে চিনতে সমস্যা হয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অনুব্রতর মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সিপিএম ছিল উপসর্গ আর রোগটা বাম পুলিশ ও প্রশাসন। বামফ্রন্ট সরকার কোনোদিন মমতাকে জেলে ভরেনি। পুলিশ বা জেল হেফাজতে রাখেনি। সিপিএম জানত তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সুবিধা। তাঁকে জেলে পুরলে তিনি হয়তো বড়ো নেত্রীতে পরিণত হবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক ফয়দা তুলল তা সিপিএম চায়নি। ফলে পুলিশকে বলাই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকাতে হবে। আটক করা যাবে না। মহাকরণ অভিযান বা তার ভিতর দাপাদাপি করলেও না। ইতিহাস সাক্ষী যে, পুলিশ তাঁর ওপর অত্যাচার করেছে, কিন্তু হাস্যকরভাবে তাঁকে আটক করেনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিপিএম যে ফাঁদে ফেলেছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে সেই ফাঁদেই ফেলার চেষ্টা করছেন। আজ পর্যন্ত বিজেপি যত ধরনের ছোটো-বড়ো আন্দোলন করেছে, তাতে তাদের কোনো প্রথম সারির নেতা-নেত্রীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসন আটক করে রেখেছে এমন নজির নেই। রাজ্য বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চালাকি জানে। তাই হয়তো আগামীদিনে দলীয় কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জনপ্রিয় মুখকে সামনে এনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূলকে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি করেছেন— (১) অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। (২) রাজ্য বিজেপি থেকে মুখ্যমন্ত্রী হবে। তাঁর এই দাবির প্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে যথেষ্ট চাপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীদিনে বিজেপি-র পক্ষ থেকে যিনি প্রধান রাজনৈতিক মুখ হবেন, তাঁর নেতৃত্বে নির্বাচনে জয়যুক্ত হলে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসবে বিজেপি।

মমতার রাজত্বে দারোগার থেকে চৌকিদারের হাঁক বেশি। তাই সে রাজত্ব চলতে পারে না। দেশের ২১টি রাজ্যে বিজেপি-র শাসন রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি দ্বীপ রাজ্যের মতো জেগে রয়েছে। কোতোয়ালিতে চৌকিদারেরা সে রাজ্য চালাচ্ছে। আসছে দারোগা।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

মেয়াদ উত্তীর্ণ অনুদাদা দিদির ডাস্টবিনে

সূর্যাযু দিদি,

অক্সিজেনের সমস্যা ছিলই, এবার ওষুধ নিয়ে গোলমাল। ঘুমের ওষুধ খেলে যে এমন মধুর বাণী প্রবাহিত হয় তা জেনে বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল আশ্চর্য হয়ে যাবেন। তবে আমি আশ্চর্য হইনি। আপনি দিদি অজুহাতকে যে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন তাতে আপনার প্রিয় ভাই অনুব্রত একেবারেই শিশু।

আমার আরও একটি গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। শুধু শুধু কেষ্টদাকে দোষী সাজানো হচ্ছে। গালাগাল তো কেষ্টদা দেননি। প্রচুর ওষুধ খেয়ে মাথা গরম, সেই সঙ্গে দিদি আপনার কথামতো ব্রেনে ঠিকঠাক অক্সিজেন পৌঁছয় না। এই যে ব্রেন, এটা একটি যন্ত্র। আর যান্ত্রিক গোলমালের জন্য সেই যন্ত্রের মালিককে সব সময়ে দোষী ঠাওরানো যায় দিদি? আরও বড়ো প্রশ্ন, যন্ত্রমেধা যেহেতু বোলপুরের আইসি-কে ফোন করে গালিগালাজ করেছে, তার জন্য অনুব্রত বা কেষ্টদা কেন ক্ষমাপ্রার্থনা করে দু'দু'খানা চিঠি লিখলেন তাও আমাকে বিস্মিত করেছে।

এখন এইআই-এর যুগ। মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। গোটাটাই যান্ত্রিক। কিন্তু সে লিখতে, পড়তে পারে। ইদানীং তো যে চিঠিপত্র সেই-ই লিখে দেয়। অনেকেই যন্ত্রমেধাকে দিয়ে কবিতা টবিতাও লিখিয়ে নিচ্ছেন। আর এ দিকে অনুব্রতদার ক্ষেত্রে পুরোটা উলটো হলো। গালাগাল করল যন্ত্রমেধা। আর আপনার নির্দেশে চিঠি লিখে দিলেন কেষ্টদা। সেটাও আবার নিজের নামে!

দিদি, এটা তো নতুন কিছুই নয়। অনুব্রতদাদার মুখে কখনো শোনা গিয়েছিল পুলিশকে বোমা মারার কথা, বিরোধীদের নকুলদানা খাওয়ানোর কথা, গুড়-বাতাসা বিতরণের কথা। আপনি হেসেছেন। আড়ালে হাততালিও দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম অনু-বাণী নিয়ে ধেই ধেই করে নেচেছে। তিনিই বিভিন্ন সময়ে আপনার হয়ে মানে প্রশাসনের হয়ে পুলিশকে সময় বেঁধে দিয়ে বলছেন, এর মধ্যে সবাই গ্রেপ্তার না হলে তিনি 'ভয়ংকর খেলা' খেলে দেবেন।

তখনও অনুদাদা সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হননি। ওঁর কন্যাও নন। বীরভূমের আকাশে তিনিই তৃণমূল কংগ্রেসের মুক্তিসূর্য ছিলেন। যদিও ২০২৪-এর ভোট প্রমাণ করে দিল যে তিনি জেলে থাকলেও বীরভূমের দু'টি আসনেই তৃণমূল হইহই করে জিততে পারে। তিনি সে মাটি তৈরি করে রেখেছেন। ফলে অতীতে এসব কথা বলার জন্য তাঁকে বকুনিও খেতে হয়নি, ক্ষমাপ্রার্থনাও করতে হয়নি। কিন্তু আজ কেষ্টদার সেদিন আর নেই। যন্ত্রমেধার জন্যও তাঁকেই ক্ষমা চাইতে হলো। অনুদাদার ভাষাতেই বলি, 'এটা কি মেনে নেওয়া যায়!' কথা ভেবে দেখা যায় না, তখন যাঁকে অনুব্রত বলে মনে হয়েছিল, তিনিও 'ভার্চুয়াল রিয়ালিটি' মাত্র। আসলে কেষ্টদার গলায় আপনি তো বলেছিলেন দিদি। এমন এক অনুব্রত মণ্ডল, যাঁর উপস্থিতি ও সক্রিয়তা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র স্রষ্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলি নির্দেশে ও মদতে। দিদির জোরেই তো সব করতেন। সবাই অনেক আংটি পরা অনুদাদার হাতটা দেখলেও আমি কিন্তু দিদি বরাবর আপনার হাতটাই দেখেছি। 'কে শঙ্খ ঘোষ!' বলার সময়েও আমি আপনার গলাই শুনেছি।

> **"অনুদাদা একাই নন। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে রয়েছেন এমনই বহু অবতার— যাঁদের প্রবল প্রতাপে ভস্ম হয়ে যায় প্রশাসন। আইনশৃঙ্খলা নামক যন্ত্রটি উড়ে যায়। সূর্যের শক্তিতে বলিয়ান গ্রহরা যে যাঁর নিজস্ব তালুকে তাঁদের কথাকেই আইন এমনকী, সংবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।"**

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, অনুব্রত মণ্ডল আসলে কে? তিনি কি কেবলই তিনিই? আমার মনে হয়, অনুব্রত এক রাজনৈতিক নির্মাণ। মাদুর্গাকে অসুর দমনের জন্য যেমন ইন্দ্র দিয়েছিলেন বজ্র, বরুণ দিয়েছিলেন শঙ্খ, মহাদেব ত্রিশূল, আর ব্রহ্মা দিয়েছিলেন পদ্ম— তেমনই, অনুব্রতর তেজও 'বাংলার মেয়ে' দুর্গার থেকে পাওয়া। অনুব্রত নিমিত্ত মাত্র। একই কথা পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শেখ সাহজাহানদের ক্ষেত্রেও খাটে। মুর্শিদাবাদের অত্যাচারীদের ক্ষেত্রেও। এ রাজ্য আসলে একটিই সূর্য। সেটাই থাকা উচিত। আমার গর্ব যে সেই সূর্যটি আমার দিদি।

অনুদাদা একাই নন। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে রয়েছেন এমনই বহু অবতার— যাঁদের প্রবল প্রতাপে ভস্ম হয়ে যায় প্রশাসন। আইনশৃঙ্খলা নামক যন্ত্রটি উড়ে যায়। সূর্যের শক্তিতে বলিয়ান গ্রহরা যে যাঁর নিজস্ব তালুকে তাঁদের কথাকেই আইন এমনকী, সংবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু যন্ত্রের মেয়াদ চিরকাল থাকে না, একটা সময়ে শেষ হয়ে যায়। গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি সবেরই একটি সময়সীমা থাকে। আর যন্ত্র খারাপ হয়ে গেলে শক্তিপ্রদানকারী অন্য যন্ত্র বেছে নেয়। এটাই অনুদাদার কাল হলো! মেয়াদ উত্তীর্ণ অনুব্রতর ঠাঁই এখন আবর্জনার স্তূপে।

তিনি দেখবেন, দিদি নতুন মোবাইল কিনেছেন। টাচ স্ক্রিন। সে যন্ত্রমেধাতেই চলবে। তাঁর ভাষাও কি একই হবে? □

অতিথি কলম

রাজনাথ সিংহ

সন্ত্রাসবাদ কী করে ধ্বংস করতে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছে ভারত

সন্ত্রাসবাদ হলো মানবিকতার একটি পাপ। শহিদ হওয়ার বিপ্লব। কিছুটা হিংসার রোমান্টিক প্রলেপ দিয়ে হত্যার দর্শন। এগুলি পাপের বাহ্যিক আবরণ মাত্র। চালু কথাটা বেশ কায়দা করে বলা হয়। একজনের কাছে যে সন্ত্রাসী অন্যজনের কাছে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী। এটি একটি বিপজ্জনক অর্থহীন কথা, কোনো সত্যিকারের স্বাধীনতা কখনোই আতঙ্ক ও রক্ত উৎসবের দ্বারা অর্জিত হয় না।

সন্ত্রাসবাদকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পুঁজি হচ্ছে আতঙ্ক তৈরি করা। কিন্তু এই আতঙ্ক বিতরণের মাধ্যমেও সন্ত্রাসীরা আক্রান্তের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে না। ভারতের সাম্প্রতিক পহেলগাঁও পরবর্তী ঘটনাক্রম তাই প্রমাণ করে। এই সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতায় ২৬/১১ বা ২০০১-এর সংসদ আক্রমণ বা একেবারে সাম্প্রতিক পহেলগাঁওয়ে নৃশংসতা ভারতকে এর মোকাবিলায় আরও শক্তিমান, দীর্ঘকায় ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তুলেছে, যা হয়তো অতীতে অতটা প্রতীয়মান হয়নি। সমস্ত শান্তিকামী জাতির একজোট হয়ে এই রোগের নিরাময়ে হাত লাগানো দরকার।

এখানেই ভারতের বিশেষতা যে পথপ্রদর্শকের কাজ করছে। কয়েক যুগ ধরে আমরা পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে থেকেছি। পাকিস্তান অন্ধসেজে থেকেছে। পহেলগাঁওয়ের সদ্য আক্রমণটি একটি ব্যর্থ, মানবিক অ্যাডভেঞ্চার ছিল যা ভারতের একতাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদীরা যেভাবে নিহতদের প্রত্যেকের ধর্ম নিয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছিল তা নির্দ্বিধায় এই সত্যই উন্মোচিত করে। মনে রাখতে হবে, ড্রোন দিয়ে ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের উপাসনালয়গুলির ওপর আক্রমণও একই উদ্দেশ্যে অনুযায়ী। কোনো ধর্মই এমন পাশবিক ক্রিয়াকর্ম অনুমোদন করে না। সন্ত্রাসবাদীরা ঘৃণ্যভাবে মজহবকে তাদের বর্বরতার সমর্থনে প্রয়োগ করেছিল। মজহবের এই ধরনের অপব্যবহার কখনোই আবেগপ্রসূত নয়। এটি অতি যত্ন সহকারে চিন্তাপ্রসূত কৌশলে নৃশংসতাকে মান্যতা দেওয়ার অপচেষ্টা।

এক্ষেত্রে ভারত কিন্তু পরিষ্কার করে দিয়েছে যে সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি 'শূন্য' সহনশীলতার। শান্তি আলোচনা আর সন্ত্রাসবাদ হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না। ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো আলোচনা কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদ এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই চলতে পারে। এ বিষয়ে পাকিস্তান যদি সত্যিই ইচ্ছুক থাকে তাহলে ইউএন-এর দ্বারা ঘোষিত সন্ত্রাসী হাফিজ সঈদ আর মাসুদ আজহারকে ভারতের হাতে তুলে দিক। এ প্রসঙ্গে বলা যায় অতীতে আমাদের সেনাবাহিনীকে কেবলমাত্র প্রতিরক্ষামূলক কাজ করার অনুমতি দেওয়া হতো। কিন্তু ২০১৬-র সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ২০১৯-এর বালাকোট ধ্বংস আর এবারের অপারেশন সিঁদুর পাকিস্তানি মদতপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ক্ষেত্রে ভারতের মূলগত নীতিকেই আগাপাশতলা পালটে দিয়েছে। সামরিক নীতিতে ঘষামাজা করেছে।

এখন আমাদের নীতি হলো, সক্রিয়ভাবে যেখানেই সন্ত্রাসবাদীর হদিশ পাওয়া যাবে সেখানেই আমরা তাদের বিনাশ করব। আজ যে কোনো সন্ত্রাসমূলক কাজকেই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে ধরা হবে। এর উত্তরেও কোনোভাবে বেসরকারি সন্ত্রাসবাদী বা সরকার-পোষিত সন্ত্রাসী বলে আলাদা করা হবে না। হ্যাঁ, যদি পাকিস্তান তার মাটি থেকে তার সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে তাহলে তার মূল্য তাদেরই চোকাতেই হবে।

সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'No money for terror' বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের এক Counter terrorism নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন আমরা মনে করি কেবল একটিমাত্র আক্রমণই পর্যাপ্ত বলে গণ্য হবে এবং এই সূত্রে একটি জীবন নষ্ট হলেও তাকে ব্যাপক সংখ্যক মৃত্যু বলেই গণ্য করা হবে। তাই সন্ত্রাসবাদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না'। ভারত সরকার ও সামরিক বাহিনী অপারেশন সিঁদুরকে সফল করে বিশ্বের কাছে প্রমাণ রেখেছে যে সন্ত্রাসবাদ ধ্বংস করতে আমরা দায়বদ্ধ। এই সূত্রে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে,

> “পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে অভিষ্ট সাধনের একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ঠিক সেই কারণেই ভারত কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক কৌশলেই পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে ফেলেছে।”

সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কোনো বাড়াবাড়ি ছাড়াই আমাদের আক্রমণ ছিল পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসবাদীদের যে ঘাঁটিগুলি লালিত পালিত হচ্ছে তার নিকেশ করা। অবশ্যই পিওকে (পাক-অধিকৃত কাশ্মীর)-সহ।

আমরা জানি সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রয়োজন কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সন্ত্রাসবাদীদের ভিত্তিভূমি তাদের আঁতুড়ঘরকেই ধ্বংস করে ফেলতে হবে। যেহেতু পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে অভীষ্ট সাধনের একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ঠিক সেই কারণেই ভারত কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক কৌশলেই পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে তাকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন করেছে। সকলেই জানেন, আমরা সিন্ধু জল চুক্তিকে সাময়িকভাবে বাতিল করেছি যতক্ষণ না পাকিস্তান সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাদকে ঘোষিতভাবে ও কাজে থামিয়ে না দেয়।

জল বন্ধের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ওপর গভীর রেখাপাত করবে। সিন্ধুনদের জলের ওপর পাকিস্তানের ১ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টর চাষজমির ৮০ শতাংশ এবং সামগ্রিক জল প্রয়োজনের ৯৩ শতাংশ নির্ভরশীল। এই জলের অভাবে দেশের ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ এবং কৃষিজ উৎপাদন যা জিডিপি-র এক চতুর্থাংশ তা ব্যাহত হবে। মনে রাখা দরকার, সন্ত্রাসবাদ শুধু ভারতের সমস্যা নয় এটি বিশ্বজনীন সমস্যা। যে কারণে সন্ত্রাসবাদকে সমূলে নির্মূল করতে হলে টুকরো টুকরো করে অ্যাকশন নিলে হবে না। এর জন্য পাঁচটি বিন্দু রয়েছে :

(১) প্রথমত, সন্ত্রাসবাদ কী, এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে তার সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। সবচেয়ে কাছাকাছি আমরা যে জায়গায় পৌঁছেছি সেটি হলো রাষ্ট্রসঙ্ঘে Comprehensive Convention against International Terrorism যে প্রসঙ্গটি ভারতই উত্থাপন করেছিল। কোনো জাতিগত সমস্যা সন্ত্রাসবাদের শিকড় হয়ে যেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সংকুচিত না করে দেয়। সেই কারণে সন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিত করণ ও তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ এবং তাদের সূত্রে সন্ত্রাসবাদীদের সর্বদেশগ্রাহ্য একটি সংজ্ঞা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। একই সঙ্গে যাতে বিদেশ থেকে সন্ত্রাসবাদীদের বিশ্বব্যাপী সরবরাহ বন্ধ হয় সেটা দেখাও জরুরি।

(২) এই সূত্রে শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীদের সংগঠনকে অর্থনৈতিক মদত বন্ধ করলেই হবে না, মদতদাতা দেশগুলি ওপরও এই অর্থনৈতিক নিষেধজ্ঞাকে বলবৎ করতে হবে। বিশ্বের বহু ধরনের সংগঠন ও অর্থপ্রদানকারী দেশগুলিকে এটা মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তানের ইতিহাসে এই ধরনের অনুদানের অপপ্রয়োগ বিস্তর। তারা অন্য কোনো ঋণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পাওয়া বিদেশি অর্থকে ঘুরপথে সীমান্ত পারে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার কু-পথ অবলম্বন করে। সেই কারণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পাকিস্তানকে FATF দ্বারা আবার কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে, সমস্ত টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ইসলামাবাদ বিশ্বাসযোগ্যভাবে এবং অলঙ্ঘভাবে তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করার অঙ্গীকার না করে।

(৩) আর একটা জিনিস যা দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বের দেশগুলির ধারণা ছিল যে, সরকারি প্রশ্রয়ের সন্ত্রাসবাদ এবং কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের নিজস্ব পরিচালনার সন্ত্রাসী আক্রমণ দু'টিই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। হ্যাঁ, এটি একেবারে প্রকাশ্যে এসে পড়ল যখন চিহ্নিত জেহাদি সন্ত্রাসবাদী নিহত হওয়ায় সসম্মানে বিদায় জানানো হলো। শুধু তাই নয়, যেখানে সামরিক অফিসাররা ফুল ইউনিফর্মে তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিলেন। পাকিস্তানে একটা ভয় সবসময় কাজ করে যে পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার না সন্ত্রাসবাদীদের হাতে চলে গিয়ে প্রলয় ঘটিয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক সমর বিশারদরা এই বিষয়টি যত্নসহকারে অনুধাবন করে পাকিস্তানের মারণাস্ত্রগুলিকে International Atomic Energy Agency-র কড়া নিরীক্ষণে রাখুন।

(৪) সেই সমস্ত দেশকে চিহ্নিত করা দরকার যারা তাদের প্রতিবেশী দেশগুলিকে অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে দিতে সন্ত্রাসবাদকে গোপনে লালন করে। তাদের কড়াভাবে বোঝানো যে, সন্ত্রাসবাদী হামলার কতটা কড়া প্রতিরোধ করা হবে, তা কখন কোথায় ঘটেছে বা আক্রান্তের প্রকৃতি কী ছিল তার ওপর নির্ভর করে না।

(৫) সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল পাকিস্তানের ছত্রছায়ায় তারা এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা), নিজস্ব ইলেকট্রনিক সিস্টেম, বায়োটেকনলজি ও ন্যানোটেকনলজি ব্যবহারের নিরাপদ সুবিধে পায়। এই কারণেই সারা বিশ্বের সহযোগিতাই এই ধরনের সর্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের প্রসারকে রুখতে একমাত্র পথ। সময় এসে গেছে— সমস্ত দেশগুলির একত্রিত হয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা এবং 'Comprehensive Convention against International Terrorism'কে বাস্তবায়িত করা। এই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ৯/১১-র জঙ্গি আক্রমণের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বলেছেন, 'আমাদের যে কোনো সন্ত্রাসবাদকেই কোনো রকমের আদর্শবাদ, রাজনীতি বা মজহবি অজুহাতকে উপেক্ষা করে কড়া হাতে শিক্ষা দিতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে'। ভারত এখন সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে সর্বান্তঃকরণে তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বদ্ধপরিকর।

(লেখক কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক রাধাবল্লভ মণ্ডল গত ৩০ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা শাখার স্বয়ংসেবক তথা সহকার ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়া প্রমুখ বিধান হালদারের পিতৃদেব বাসুদেব হালদার গত ৯ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ১ কন্যা রেখে গেছেন।

বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার অপরিহার্য ও জরুরি

গত দশ বছরে বেশ কিছু বড়ো সংস্কারের ফল ভারত পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো GST, IBC, RERA। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ভূ-রাজনৈতিকভাবে শক্তির উৎস সমূহকে বহুমুখী করা ইত্যাদি বহু সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। তাছাড়া ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেম, ওএনডিসি (ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স), মুদ্রা যোজনায় ঋণ, ব্যাংকের জন ধন অ্যাকাউন্ট, মোবাইল নম্বর ও আধার কার্ডের সংযুক্তীকরণ (JAM trinity)-এর মতো অসংখ্য প্রকল্প ভারতের প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষদের দেশের বৃহৎ আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্তীকরণে সহায়ক হয়েছে। 'Ease of Doing Business'-এর প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ গুরুত্বদানের কারণে ভারতের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ক্ষেত্রে বড়ো সাফল্য এসেছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা আজকের দিনে অনেক পরিকল্পনামাফিক হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় হিসেবে বলা যায়, আইআইএসসি, ব্যাঙ্গালুরু বা রুরকি আইআইটি-র মতো বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাইওয়ানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চিপের বিষয়ে গবেষণা করছে।

জার্মানির স্টুটগার্ট বা নেদারল্যান্ডসের ডেলফ্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি-র সঙ্গে পরিবেশ ও জলসম্পদ বিষয়ে গবেষণার যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইসব পদক্ষেপের ফলও পেয়েছে দেশ। গত দশ বছরে দেশের পরিকাঠামো ক্ষেত্র তথা সড়কপথ, রেলপথ, বিমান পরিষেবা, জলপথ ও বন্দর, এনার্জি সেক্টর ও ইন্টারনেট পরিষেবায় এসেছে এক বড়ো পরিবর্তন। তাই জিডিপি-র নিরিখে, মার্কিন ডলারের নমিনাল ভ্যালুর হিসাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে দশ থেকে চতুর্থ স্থানে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। আর ডলারের পারচেজ পাওয়ার প্যারিটি মূল্যায়নে বহুদিন ধরেই তিন নম্বর স্থানে রয়েছে ভারত।

২০৪৭ সালে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতি হয়ে ওঠার লক্ষ্যে আরও কিছু রাস্তা নিতে হবে ভারতকে। এর মধ্যে সবার আগে প্রয়োজন— 'এনফোর্সমেন্ট অফ কন্ট্র্যাক্ট'। অর্থাৎ, চুক্তিকে মানা। ব্যবসা করে পণ্য ও পরিষেবা নিয়ে দাম মেটানোর সময় পিছিয়ে আসা একটা বড়ো রোগ। বহু মানুষ এই অন্যায়ের বলি হয়ে-ধনে প্রাণে মারা যাচ্ছে। আর এর জন্য প্রয়োজন বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার। সংসদের মাধ্যমে প্রয়োজন সংবিধান সংশোধনী প্রণয়ন।

দ্বিতীয় সংস্কারটি প্রয়োজন প্রশাসনিক বিভাগে। বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একজন কমবয়সি, এবং অন্য রাজ্য বা জেলার বাসিন্দা ১১-১৩ মাসের মেয়াদে কোনো একটি জেলার 'জেলাশাসক' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জেলাশাসকের মতো একজন জুনিয়র আধিকারিক জেলার বিদ্যুৎ থেকে সেচ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলায় ন্যূনতম তিন বছরের জন্য একজন সিনিয়র (কম করে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পদমর্যাদার) জেলা পরিষদ মুখ্যসচিব প্রয়োজন। সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরে প্রয়োজনে যুগ্মসচিব পদ থেকে আইএএস-দের সরিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউকে নিয়ে আসতে হবে।

তৃতীয়ত, বর্তমান ভারত এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের উপর নির্ভর করে। কৃষি ও শিল্প বৃদ্ধিতে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ভূমিকা অনেক কম। এখানে পেশাদার ব্যক্তি বা সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিয়ে দেখতে হবে সমস্যা কোথায় এবং কী তার সমাধান। দেশভাগের সময় ঢাকা ও চট্টগ্রাম ভারতের বাইরে চলে যাওয়ায় উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত প্রায় স্থলবেষ্টিত ভূখণ্ডে পরিণত হয়। এরপর কলকাতার ব্যবসামহল, আমলাতন্ত্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগৎ, সংবাদমাধ্যম বাম-জেহাদিদের দখলে চলে যাওয়ায়, উত্তর ও উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের অধিকাংশ রাস্তা বন্ধ। দেশের এত বড়ো ভূখণ্ডকে উন্নয়নের বৃত্তের বাইরে রেখে, শুধু পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের জোরে এগিয়ে গিয়েও কি দেশের পক্ষে ২০৪৭-এ শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন সম্ভব হবে?

চতুর্থত, নতুন ভারতকে জোর দিতে হবে 'ইনোভেশন' বা উদ্ভাবনে। একটা ছোটো ইউপিআই উদ্ভাবন ভারতের ৫০ শতাংশ মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে বিপ্লব। প্রথম শিল্পবিপ্লবের পর তার ফল পেয়েছে ইউরোপ। কম্পিউটার তথা তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লবের ফল পেয়েছে আমেরিকা, চীন ও ভারত-সহ কিছু দেশ। পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভাবনে পিছিয়ে পড়ার কারণে ইউরোপের বড়ো অংশ এই ক্ষেত্রে অনগ্রসর হয়ে পড়ে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে চলছে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ। এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারতকে মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা থেকে শুরু করে অটোমোবাইল, টেলিকমিউনিকেশন প্রতিটি সেক্টরে চীন, আমেরিকার চেয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নবীন প্রজন্মের দেশ হলো বর্তমান ভারত। শিক্ষা ও গবেষণাকে হাতিয়ার করে এগোলে ভারতের সাফল্য এক্ষেত্রে নিশ্চিত।

পঞ্চমত, ঢালাও বিলগ্নীকরণ প্রয়োজন। প্রায় ৮০০টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রয়েছে, যাদের অধিকাংশই কোনোরকম পরিষেবা দেয় না। অথচ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গবেষণা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। তাছাড়া টেলিকম ও বিমান পরিষেবা বেসরকারি হাতে আসার পর দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষরাও এই পরিষেবা পাচ্ছেন। ১৯৯৮-এর আগে এই বিষয়গুলি ভাবাই যেত না। ফলে এই দিকে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগী ও মনোযোগী হতে হবে।

পরিশেষে, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, পুলিশবিভাগ, রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থা প্রয়োজন। একজন বিচারপতি 'দুর্নীতিগ্রস্ত' জেনেও যদি দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাকে ক্ষমা করে দেয়, তবে বলতে হয় সেদেশে মাৎস্যন্যায় চলছে। ভারতকে অর্থনৈতিক উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছতে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ক'টি সংস্কার অপরিহার্য ও জরুরি।

ভারতবাসীর আশা পূরণে বদ্ধপরিকর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার

সুদীপ্ত গুহ

কোনো একটা দেশে যদি সবাইকে কার্পেন্টার, ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেকট্রনিক্স মেরামতি, প্লাম্বার, লোহার কাজ, মাটির কাজ থেকে রান্না করা— সব কিছুতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর বলা হয় তোমরা রান্না করা এবং প্লাম্বারের কাজ ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। বাকি সব পরিষেবা বা পণ্য নেওয়া হবে পাশের গ্রাম থেকে। এটা কি কোনো সুস্থ আর্থিক ব্যবস্থা? বহু মানুষকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে গত এগারো বছরে। সবাই এককথায় বলেছেন অবাস্তব। এরপরে, যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে ভারতে সরকারি চাকরি এবং সফট্‌ওয়ার ছাড়া অন্য কোনো পেশা প্রায় নেই কেন বা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেতন আজ ১০০ দিনের কাজের সমান কেন? পদার্থবিদ্যা হোক বা সমাজতত্ত্ব, হিসাবশাস্ত্র হোক বা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, এমনকী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবাই দৌড়াচ্ছিলেন হয় সরকারি চাকরির জন্য, নইলে সফট্‌ওয়ার কোম্পানিতে কাজের জন্য। কারও কাছে উত্তর ছিল না।

কিন্তু ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এক অদ্ভুত ব্যবস্থা লক্ষ্য করলেন। বিশ্লেষণ করে দেখলেন, এই অবস্থার অন্যতম কারণ, ভারত ম্যানুফ্যাকচারিং তথা উৎপাদন প্রায় করতোই না। পুরোটাই বিদেশের উপর নির্ভরশীল। এখন প্রশ্ন, আমেরিকাও তো নির্ভরশীল? তাহলে ভারতের সমস্যা কোথায়? উত্তর হলো, আমেরিকান ডলার হলো আন্তর্জাতিক মুদ্রা। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শুধু ডলার ছাপিয়ে বাজারে ছেড়ে অন্যের কষ্টার্জিত পণ্য ও পরিষেবা ভোগ করেছে। ভারতের নীতিনির্ধারকরা আমেরিকাকে অন্ধের মতো নকল করতে গিয়ে সেই ফাঁদে পা দিয়ে সম্পূর্ণ পরনির্ভর করে ফেলেছিল দেশকে। ভারতের টাকা তো আন্তর্জাতিক মুদ্রা নয়। ভারত কি এই বিলাসিতা করতে পারে?

এই অবস্থায় নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে লক্ষ্য করলেন :

(১) শক্তিক্ষেত্রে ভারত মধ্যপ্রাচ্যের উপর নির্ভরশীল। (২) ভোজ্য তেলের জন্য ভারত নির্ভরশীল লাতিন আমেরিকা, পূর্ব এশিয়া এবং রাশিয়া-ইউক্রেনের উপর। (৩) ইলেকট্রিক দ্রব্যের জন্য চীন। (৪) মাইক্রোচিপের জন্য তাইওয়ান, চীন। (৫) এলইডি বাতির জন্য চীন। (৬) ওষুধের পেটেন্টের জন্য আমেরিকা এবং উপাদানের জন্য চীন। (৭) ইউরেনিয়ামের জন্য রাশিয়া। বিভিন্ন খনিজের জন্য অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও লাতিন আমেরিকা। (৮) যাওয়ার আগে এমন জমিনীতি বানিয়ে গেছেন ড. মনমোহন সিংহ, যে ভারতের ব্যবসায়ীরা চীন বা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ শ্রেয় মনে করেছে। (৯) আয়করের ক্ষেত্রে প্রণববাবুর করে যাওয়া রেট্রোসপেক্টিভ আইন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশ সম্পর্কের ভীতির সঞ্চার করে গেছে। (১০) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগ নেই। (১১) দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ ব্যাংকিং সিস্টেম এবং সামাজিক সুরক্ষার বাইরে। ছোটো কৃষক থেকে ছোটো ব্যবসায়ী অর্থের জন্য সেই মহাজনের কাছেই যায়। ভারত তখনও যেন সেই 'দুই বিঘা জমি'র পৃথিবী। (১২) ইন্টারনেট পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু হয়েছে, কিন্তু দেশের মানুষকে বহু টাকা কমিশন গুনতে হচ্ছে ভিসা কার্ড, মাস্টার কার্ড বা SWIFT নেটওয়ার্কিং কোম্পানিকে। (১৩) করব্যবস্থা এত জটিল যে মুম্বই থেকে কলকাতা ব্যবসা করার চেয়ে মুম্বই থেকে সিঙ্গাপুর ব্যবসা করা সহজ। দেড় ডজন অদ্ভুত সব অপ্রত্যক্ষ কর। (১৪) পরিকাঠামো অচল। (১৫) অগ্নিমূল্য ইন্টারনেট ডাটা।

> **দেশ আরও এগিয়ে যাবে। প্রয়োজন বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, পুলিশ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার। আরও বেশি সরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণায়। দুর্নীতির বিষয়ে প্রয়োজন আরও কড়া আইন, যাতে ক্ষমতাবান ও প্রভাশালীরা ছাড়া না পেয়ে যান।**

এককথায়, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, বিমান সরঞ্জাম, গাড়ি, ব্যাটারির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধ, দূরভাষ যন্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সৌরশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ইস্পাত, সিমেন্ট, সার থেকে বেনারসি শাড়ি, পুতুল হয় ভারত তৈরি করত না, নয় দাম এতো বেশি ছিল যে দেশবাসী সেটা কিনতেই পারত না। না ছিল আধুনিক প্রযুক্তি, না ছিল গবেষণার পরিবেশ। ব্যাপারটা অনেকটাই বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই গোছের। পড়াশোনা করেছি, কিন্তু বাড়িতে কাজের লোক না এলে বৃষ্টির দিনে আদা-চা করে খাবারও মুরোদ নেই। মাইনের সব টাকা কাজের লোক, ড্রাইভার থেকে ইলেকট্রিশিয়ানের জন্য খরচ হয়ে যায়।

ফঃ ২

ভারতও পরিষেবা ক্ষেত্রে (তথ্য প্রযুক্তি, সফট্ওয়ার ইত্যাদি) যা সঞ্চয় করতো, তার একটা বড়ো অংশ চলে যেত বিদেশ থেকে পণ্য ও পরিষেবা কিনতে। এমনকী ভারতের বস্ত্রবাজারেও রাজত্ব করতো বাংলাদেশিরা। ভারতের রিলায়েন্স কোম্পানি যশোর- খুলনায় কাপড় বানিয়ে বেচত কলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার বাজারে।

কিন্তু ভারত কেন পারত না? পারা কি আদৌ সম্ভব, না সম্ভব নয়? কিন্তু পরনির্ভরতা তো কমাতে হবে? নইলে কাল যদি চীন ওষুধের উপাদান পাঠানো বন্ধ করে কিংবা মধ্যপ্রাচ্য তেল, কিংবা ইন্দোনেশিয়া ভোজ্য তেল, কোথায় যাবে ভারত? হঠাৎ যুদ্ধ লাগলো, আর চীনের কথা শুনে রাশিয়া সাহায্য বন্ধ করে দিল। কী করবে ভারত? আর ঠিক এই কারণেই কিন্তু ভু-রাজনীতিতে ভারত পিছিয়ে ছিল। ভারতে কেউ বোমা মেরে গেলে, মৌখিক প্রতিবাদটুকু করত অনেক চিন্তা করে। আর এখানেই নরেন্দ্র মোদী আত্মনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু আত্মনির্ভরতা ব্যাপারটা কি এতই সহজ? যদি হতো, বাকিরা পারলেন না কেন? সমস্যা কোথায় ছিল? আসলে ভারত একটা দশ অশ্বশক্তির যন্ত্র, যা চলছিল দুই অশ্বশক্তিতে। বস্তাপচা ব্রিটিশ যুগ/সোভিয়েত যুগের আইন, জটিল কর ব্যবস্থা, কোম্পানি আইনের অসম্পূর্ণতা আর কৃষকদের অবস্থা তো জালনিবদ্ধ রোহিত। একজন কৃষক একমাত্র সরকার নির্ধারিত ফড়েদেরই কিংবা সরকারি গুদামেই তাঁর শস্য বেচতে পারতেন।

কীভাবে এই দুই অশ্বশক্তিতে চলা দেশকে নরেন্দ্র মোদী নিজের শক্তিতে চলার জায়গায় আনলেন? (১) দেশের সব মানুষকে জনধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে দিলেন। (২) দেশের দরিদ্রতম মানুষকে প্রথমবার হাতে ধরালেন জীবন বিমা, দুর্ঘটনা বিমা এবং চিকিৎসা বিমা পলিসি। (৩) প্রতিটি অ্যাকাউন্ট হোল্ডার পেলেন একটি করে রুপে কার্ড, যা বিশ্বব্যাপী রাজত্ব করা ভিসা ও মাস্টার কার্ডের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেললো। (৪) আন্তর্জাতিক অনলাইন লেন-দেনের মাধ্যমে তথা SWIFT-এর বিকল্প হিসেবে আরও সহজে ব্যবহার করা UPI নামক ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম চালু করলেন। (৫) দেশের সব নাগরিককে বললেন, নিজের আয় ঘোষণা করে কর দিয়ে দিতে। নইলে আগামীদিনে আরও কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে। (৬) এরপর নোটবন্দি ঘোষণা করলেন। দেশের সব ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করলেন। (৭) কিছুদিনের মধ্যে দেশের দেড় ডজন অপ্রত্যক্ষ করের বদলে আনলেন একটা মাত্র কর তথা জিএসটি অর্থাৎ পণ্য ও পরিষেবা কর। (৮) ভারতে ১৯৬৯-তে ব্যাংক জাতীয়করণ হলেও, ব্যাংকের হাতে তার নিজের টাকা আদায়ের ক্ষমতা দেননি ইন্দিরা গান্ধী। দেশের এক দল বড়ো ব্যবসায়ী এই সুযোগে কোটি কোটি টাকা লুট করতেন এবং সরকার টাকা ছাপিয়ে ব্যাংককে বাঁচিয়ে রাখত। আমানতকারীর সরাসরি ক্ষতি না হলেও, মুদ্রাস্ফীতিতে মানুষের প্রকৃত আয় কমে যেত। ২০০২-এ অটলবিহারী বাজপেয়ী সারফায়েসি আইন প্রণয়ন করে ব্যাংককে টাকা আদায়ের আইনি ক্ষমতা দিলেন। কিন্তু ২০০৪ থেকে ২০১৪, সেই আইনও বলবৎ হয়নি। তাছাড়া কোম্পানি বন্ধ করার কোনো আইন ছিল না। নরেন্দ্র মোদী ২০১৬-তেই আনলেন ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রুপসি কোড। এই কোড ব্যাংককে ক্ষমতা প্রদান করে ঋণখেলাপি কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণা এবং ওই কোম্পানি বিক্রি করে নিজের টাকা উদ্ধারে। গত আট বছরে এটা অন্যতম বড়ো সংস্কার। (৯) আবাসন ক্ষেত্রে ক্রেতাকে সঠিক অধিকার দিতে আনা হলো RERA। (১০) এরপর আনা হলো তিনটি কৃষি বিল, যা কৃষি বিপণনে বিপ্লব আনতে পারতো। কিন্তু আড়াইটি রাজ্যের প্রতিবাদে পিছিয়ে আসতে হয় কেন্দ্র সরকারকে। তবে এই বিল দেশের কৃষকদের জন্য নতুন সুযোগ এনে দেবে এবং সরকার আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আবার এই বিল আনবে। (১১) দুশো শ্রমিক আইনের বদলে আনলেন চারটি লেবার কোড। শ্রমিকদের মাইনে অনলাইন করা আগেই বাধ্যতামূলক করেছিলেন। (১২) মুদ্রা যোজনা, যেখানে ছোটো ব্যবসায়ীর জন্য আরও কিছু সংস্কার আগামীদিনে আসতে চলেছে। ব্যাংকিং, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থায় বড়ো সংস্কার আগামীদিনে আসছে। কারণ দেশের পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা সঠিক না হলে কেউ দেশে বিনিয়োগ করবে না।

মূল সংস্কার ছাড়াও, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলাদা নীতি তৈরি করেছে ভারত সরকার। যেমন, মাইক্রোচিপ, উৎপাদন ক্ষেত্র, গ্রিন (প্রাকৃতিক) হাইড্রোজেন, ইলেকট্রিক ব্যাটারি, ইলেকট্রিক গাড়ি, সার, ওষুধ, আন্তর্জাতিক খনিজ সম্পদের মালিকানা, পরিকাঠামো, ভোজ্যতেল, শিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণা বিশেষত প্রতিরক্ষা, চিকিৎসাক্ষেত্র এবং কৃত্রিম মেধা এই প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার আলাদা নীতি বানিয়েছে।

শিক্ষাবিস্তারে প্রতিটি রাজ্যে খোলা হয়েছে নতুন IIT, IIM, AIIMS, IIIT, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, জাতীয় আইন কলেজ। প্রশিক্ষণের জন্য শুরু হলো স্কিল ইন্ডিয়া প্রকল্প।

এতোসব সংস্কার যজ্ঞের ফল গত অর্থবর্ষে দেশবাসী দেখতে পেয়েছে। তার কিছু এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে— (১) জিডিপি বৃদ্ধির হার উন্নত দেশগুলির চেয়ে বেশি এবং কয়েকদিন আগে ভারত জাপানকে জিডিপিতে ছাড়িয়ে গিয়ে এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। (২) রপ্তানিতে ভারত এই বছর রেকর্ড করেছে। বর্তমানে ভারতের রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৭৫০ বিলিয়ন ডলার। (৩) ফোরেক্স রিজার্ভে ভারত সর্বকালীন রেকর্ড ৬০০ বিলিয়ন ডলারের মাত্রা অতিক্রম করেছে। (৪) দেশের সবক'টি ব্যাংকের লাভ প্রথমবার ছাড়িয়েছে এক লক্ষ কোটি টাকা। (৫) এই আট বছরে সড়কপথ হয়েছে দ্বিগুণ। (৬) বিমান নেটওয়ার্ক তিনগুণ হয়েছে। (৭) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বেড়েছে তিনগুণ। (৮) ইন্টারনেট ডাটা ব্যবহার বেড়েছে ৫৪ গুণ। (৯) প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে আড়াই গুণ। (১০) ভারতীয় মুদ্রার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেছে।

দেশ আরও এগিয়ে যাবে। প্রয়োজন বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, পুলিশ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার। আরও বেশি সরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণায়। দুর্নীতির বিষয়ে প্রয়োজন আরও কড়া আইন, যাতে ক্ষমতাবান ও প্রভাশালীরা ছাড়া না পেয়ে যান। দরকার Enforcement of Contract নিশ্চিত করা। ভারতবাসীর আশা, ভারত সরকার এই লক্ষ্য পূরণ করতে বদ্ধপরিকর। □

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখবে ভারত

তারক সাহা

গত ৬ মে রাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী অতর্কিতে পাকিস্তানে প্রবেশ করে সন্ত্রাসবাদীদের ৯টি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে এবং শতাধিক জঙ্গি খতম করেছে। এই হামলা কখনোই পাকিস্তানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার ঘটনা নয় তা বিশ্বের সমস্ত দেশ জানে। এই হামলা পহেলগাঁওয়ের নারকীয় ঘটনার এক জবাবমাত্র। ভারত সর্বদা ধৈর্যশীল এক দেশ। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর গত আটাত্তর বছরে পাঁচবার ভারত আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রতিবার তার যোগ্য জবাব দিয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী। অনেকবার ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের বহু এলাকা দখল করেছে, কিন্তু যুদ্ধবিরতির পর ভারত অধিকৃত জমি ফেরতও দিয়েছে।

পাকিস্তান সার্বিকভাবে ভারতের থেকে অনেক পিছিয়ে। শত্রুতা চালিয়ে এবং পাঁচবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পরাস্ত হয়েও ভারতের অভ্যন্তরে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান, যাকে সামরিক ভাষায় ছায়াযুদ্ধ বলা হয়। কিন্তু বর্তমান ভারত এটাকে ছায়াযুদ্ধ বলতে নারাজ। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জঙ্গি হামলা হলে পুরোপুরি যুদ্ধ বলা হবে এবার থেকে। যুদ্ধ হলো প্রকৃত অর্থে জীবন ও সম্পত্তির হানি এবং দেশের মধ্যে এক অযাচিত অস্থিরতা সৃষ্টি করা। এই ঘটনার যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তার জবাব পাকিস্তানকে অপারেশন সিঁদুরের মতো দেবে ভারত। স্পষ্ট ভাষায় প্রধানমন্ত্রী তা পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছেন।

পাকিস্তানের জঙ্গি নীতি কয়েক দশকের পুরাতন। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে এই নীতি নিয়ে চলছে অনেক আগে থেকেই। এই নীতি তৈরি করে যান জেনারেল জিয়া-উল-হক। জিয়ার সময় থেকেই ভারতকে রক্তাক্ত করে আসছে পাকিস্তান কখনো প্রত্যক্ষে, কখনো আড়ালে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন ভারতের অপারেশন সিঁদুর অভিযানে বিধ্বস্ত পাকিস্তান নতজানু হয়ে সংঘর্ষবিরতি চেয়েছিল ভারতের কাছে। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সাময়িক বিরতি মেনে নেয় ভারত। কিন্তু এই সংঘর্ষবিরতির বিরোধিতা করছে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা। তাদের মতে ভারতের কাছে পাকঅধিকৃত কাশ্মীরের ভারতভুক্তির এটা ছিল মোক্ষম সময়। কিন্তু ভারত সরকার সংঘর্ষ চালিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করেনি।

কারণ ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ চালিয়ে গেলে ভারতের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। এই মুহূর্তে বার্ষিক সাড়ে ছয় শতাংশ উন্নয়নের হার থমকে যাবে, দশকোটি মানুষের উচ্চ মধ্যবিত্ত স্তরে উন্নীত হবার গতি রুদ্ধ হবে, নির্মাণ শিল্পের গতিরোধ-সহ সেমিকন্ডাক্টর এবং এআই নিয়ন্ত্রিত শিল্পের ক্ষতিসাধন হবে। অন্যদিকে, পাকিস্তান ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। এই ভিক্ষার অর্থে পাকিস্তান তার সমরভাণ্ডার সাজাচ্ছে ভারতের বিপক্ষে লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে।

২০১৬-র উরি থেকে ২০২৫-এর পহেলগাঁওয়ের নারকীয় হামলার প্রায় এক দশক সময়ে ভারত যতবার আক্রান্ত হয়েছে ততবার ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। যদি বিশ্বের অন্য কোনো দেশে এমন আচরণ করতো কোনো দেশের সঙ্গে, তাহলে আক্রান্ত দেশটি পূর্ণাঙ্গ লড়াই করে আক্রমণকারী দেশকে নিজেদের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে নিত। ভারত কোনোদিন সেই পথে হাঁটেনি। ভারত বার বার বলে এসেছে সিন্ধু জল চুক্তি বাতিল থেকে অপারেশন সিঁদুর পর্যন্ত ভারত যত পদক্ষেপ নিয়েছে তা পাকিস্তানি জনগণের বিরুদ্ধে নয়, এইসব ব্যবস্থা জঙ্গি পাক সরকারের বিরুদ্ধে।

> **পাকিস্তান ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। এই ভিক্ষার অর্থে পাকিস্তান তার সমরভাণ্ডার সাজাচ্ছে ভারতের বিপক্ষে লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে।**

২০১৬ সালে উরি হামলার পর থেকে ২০২৫-এর অপারেশন সিঁদুর পর্যন্ত ভারত তার ঘোষিত নীতি থেকে একচুলও সরে আসেনি। ২০১৬-তে উরি হামলার জবাব সীমিত আকারে দিয়েছে ভারত। ২০১৯ ও ২০২৫-এ দু'বার ভারত সীমান্ত পেরিয়ে প্রত্যাঘাত করে। ২০২৫-এ বেশি মূল্য চোকাতে হলো পাকিস্তানকে। এইবার এই প্রথম ভারত ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা-সহ পাক সামরিক বিমানঘাঁটিও ধ্বংস করেছে।

ভারতের সংঘর্ষবিরতির এই সরকারি সিদ্ধান্তে কেউ কেউ অখুশি হলেও লড়াই চালিয়ে যাওয়া হঠকারী সিদ্ধান্ত হতো। তাছাড়া বিরোধীদের কাজ হলো সরকারের ছিদ্রান্বেষণ করা। তারা প্রকৃত তথ্য কখনো সামনে আনে না। দুই দেশের আর্থিক সামর্থ্য বা ক্ষমতার একটা তুল্যমূল্য হিসেব থেকে বোঝা যাবে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এই চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কতটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হতো। ১৯৮৭ সালে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি পাকিস্তানের সাড়ে চার গুণ। কালে কালে এই বৃদ্ধি এখন এগারো গুণ। বিগত অর্থ বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার যেখানে সাড়ে ছয় শতাংশ, সেখানে পাকিস্তানের আর্থিক বৃদ্ধির হার তিন শতাংশ। ভারত যখন সমরাস্ত্রের রপ্তানি করছে, পাকিস্তান সেখানে বিশ্বের আর্থিক সংস্থাগুলো থেকে ঋণ নিয়ে কিনছে তার সমরাস্ত্র। নিজেকে উন্নত দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে।

এই পরিস্থিতিতে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়া মানেই দেশের উন্নতিকে ব্যাহত করা। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত একেবারে সঠিক। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে ভারতকে। □

চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশের সম্মিলিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে ভারতকে

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে ঢাকার উসকানিমূলক বাচালতায় ভারত সরকার কঠোর মনোভাব দেখিয়েছে। কিন্তু আরও বড়ো উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা ভারত সরকারকে মাথায় রাখতে হবে। শিলিগুড়ি করিডোরের চারপাশে ভারতের যে কোনো দুর্বলতাকে বেজিং ও ইসলামাবাদ বিপজ্জনকভাবে কাজে লাগাতে পারে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের উদীয়মান বিনিয়োগকারীদের শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অঞ্চলকে উন্নতির প্রাণবন্ত কেন্দ্রবিন্দু বলে আখ্যায়িত করেছেন। ২০২০ সাল থেকে স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশি পণ্য ভারতে প্রবেশ করত এবং ভারত থেকে সেইসব পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। ভারতে বাংলাদেশি পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্তের কিছুদিন পরেই প্রধানমন্ত্রীর এই বিবৃতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মে মাসের শেষ সপ্তাহে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াও উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যকে ভু-সম্পদে পরিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। অথচ এই মুহূর্তে বাংলাদেশ জুড়ে সবরকম অশান্তির পিছনে তিনিই নাটের গুরু। তিনি হুমকি দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন ভারতের চিকেনস্ নেক কেটে দিয়ে। শুধু তাই নয়, তিনি উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যকে ভারতের থেকে দখল নেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন। ইউনুস ভালোভাবেই জানেন যে তাঁর এই বাগাড়ম্বর কতটা অন্তঃসারশূন্য। মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে। তাঁর এই দম্ভোক্তির পেছনে কে বা কারা তা সবাই বোঝে।

তাই ভারতের অনেক বড়ো দুশ্চিন্তার কারণ চীন এবং তার বিশ্বস্ত অনুচর পাকিস্তান। ভারত বাংলাদেশের থেকে কম করেও সাত ধরনের দ্রব্যের উপর আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তার মধ্যে আছে প্রস্তুত বস্ত্র। এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো রপ্তানি দ্রব্য। এছাড়া আছে ফল ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য। এসব স্থলবন্দর দিয়ে ঢুকতে পারে। তবে বাংলাদেশের বস্ত্র কলকাতা ও মুম্বাইয়ের সমুদ্র বন্দর দিয়ে ভারতে ঢুকতে পারে। এরফলে বাংলাদেশের প্রস্তুতকারকদের ও উৎপাদনকারীদের জন্য বিশাল লাভ হবে, কিন্তু ভারতীয় রপ্তানিকারী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই নিয়ন্ত্রণের কারণ হিসেবে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর স্থানীয় শিল্পকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেছে নয়াদিল্লি। ইউনুস খোলাখুলি চীনকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষত ভারতের উত্তর-পূর্ব ঘেঁষা বাংলাদেশের অঞ্চলে। খবরে প্রকাশ যে বাংলাদেশ তলে তলে পাকিস্তানের সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতা বাড়িয়ে চলেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের নৌবাহিনী পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নিয়েছিল। নিশ্চিতভাবে পাক আইএসআই-ইউনুস প্রশাসন-বাংলাদেশি জেহাদি চক্রের অন্যতম লক্ষ্য হবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অশান্ত করা।

হাসিনার সময়ে বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ সীমিত ছিল। কিন্তু এখন বাংলাদেশে চীনা কারখানা ও শিল্পনগরী গড়ে উঠছে। কিন্তু সেগুলোতে কর্মরত চীনের মানুষেরা। বাংলাদেশ জানে না চীন যে দেশে ঢোকে, সেদেশের সর্বস্ব নিয়ে নেয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বাংলাদেশ হলো নরম মাটি। তাদের ভারত-বিরোধিতার মুখ হলো এই জেহাদি শক্তির ভারে জর্জরিত, নীতিহীন বাংলাদেশ। বেজিং সারাক্ষণ অরুণাচল প্রদেশকে তাদের বলে দাবি করছে এবং সেখানকার নানা জায়গার চীনা নাম রাখছে। অরুণাচলকে তারা বলে দক্ষিণ তিব্বত।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর চীন প্রচণ্ডভাবে ভারতের উত্থানকে ব্যাহত করতে নয়াদিল্লির উপর কিছু কৌশলগত চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করবে। ঋণভারে ন্যুব্জ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার, সিঁদুর-উত্তর প্রতিহিংসায় উন্মত্ত পাকিস্তান এবং ভারতের উন্নতিতে ঈর্ষাকাতর চীন— এই তিনের সমন্বয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত হয়ে উঠছে নতুন কৌশলগত ও নিরাপত্তাজনিত রণাঙ্গন।

শিলিগুড়ি করিডোরেও চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭ সালে ডোকলাম অচলাবস্থার সময়ে চীন সুস্পষ্টভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযোগকারী শিলিগুড়ি করিডোরের উপর কৌশলগতভাবে শ্যেনদৃষ্টি রেখেছিল। এখন বাংলাদেশ এই করিডোরের খুব কাছে রংপুর বিভাগের অন্তর্গত লালমণিরহাটে ব্রিটিশযুগের বিমানঘাঁটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে। কয়েকজন চীনা আধিকারিক সম্প্রতি এই ঘাঁটিটা পরিদর্শন করে গেছে।

সূত্রে প্রকাশ, তার আগেই কয়েকজন পাক সামরিক ও গোয়েন্দা আধিকারিক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা ঘুরে গেছে। ব্রিটিশ যুগের ৬টা বিমানঘাঁটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ইতিমধ্যে বাংলাদেশ তার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে, লালমণিরহাট তার মধ্যে অন্যতম। লালমণিরহাট বিমানঘাঁটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বাংলাদেশ চীনের টাকা ব্যবহার করবে কিনা স্পষ্ট নয়। তবে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই চীনের থেকে বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদান হিসেবে ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা সতেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ কোটি টাকা গত মার্চ মাসে নিয়েছে। যেকোনো চীনা সম্পৃক্ততা ভারতের কাছে উদ্বেগের বিষয়। চীন লালমনিরহাট বিমানঘাঁটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে সামরিক ও অসামরিক উভয় উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবে এবং ভারতের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করবে।

রংপুর এলাকা বিএনপি-র শক্ত ঘাঁটি ছিল এবং তারা আওয়ামি লিগের সঙ্গে সহযোগিতা করত। কিন্তু নতুন সরকারের কিছু অংশ, জামাতি ইসলামি দল তার মধ্যে আছে, যারা রংপুর অঞ্চলে বিএনপি-র প্রভাবকে মুছে ফেলতে চাইছে। জামাত বরাবর ভারতবিরোধী। এখানে তারা চরমপন্থী ও উগ্রবাদীদের দিয়ে এই এলাকা ভরে দেবে। এতে শিলিগুড়ি করিডোর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের উপর চাপ বাড়বে। বর্তমানে এই কায়দায় চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে।

এদিকে আমেরিকা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ কবজা করে ফেলেছে বলে গোপন সূত্রে খবর। তারা চট্টগ্রামের মধ্যে দিয়ে করিডোর বানিয়ে ঢুকে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ দখল নিতে চায়। গৃহযুদ্ধবিধ্বস্ত মায়ানমারকে টুকরো করে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের স্বাধীনতা দেওয়া তাদের লক্ষ্য। এর মধ্য দিয়ে ভারত ও চীনকে চাপে রাখতে চায় আমেরিকা। কাজেই এই মুহূর্তে ভারত সরকারের সামনে বিশাল মাথাব্যথা পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত।

প্রধানমন্ত্রীকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করা একজন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে শোভনীয় নয়

মণীন্দ্রনাথ সাহা

আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে রাজ্যের তৃণমূল শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে রেখেছে অনেক সমস্যা। তার মধ্যে পাঁচটি প্রধান বিপদ। (১) সমাজের হিংসা ও অরাজকতা। (২) মা-বোনেদের নিরাপত্তাহীনতা, তাঁদের ওপর হতে থাকা জঘন্য অপরাধ। (৩) ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব। (৪) মারাত্মক দুর্নীতির ফলে প্রশাসনের ওপর থেকে মানুষ আস্থা হারাচ্ছেন এবং (৫) গরিবের অধিকার কেড়ে নেওয়া শাসক স্বার্থান্বেষী রাজনীতি।'

এছাড়া ওই সভা থেকে ভারত পাকিস্তানে 'অপারেশন সিঁদুর' কেন চালাতে বাধ্য হয়েছে, তা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসীরা আমাদের বোনেদের সিঁদুর মুছে দেওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। আমাদের সেনারা সিঁদুরের শক্তি দেখিয়ে দিয়েছে।' এতেই পরিষ্কার হয় অপারেশন সিঁদুর নামকরণের প্রেক্ষাপট। এছাড়া বঙ্গজীবনের সঙ্গে অপারেশন সিঁদুরের সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ, তাও ব্যাখ্যা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গসমাজের মা-বোনেরা বিজয়াদশমীর দিন সিঁদুরখেলায় মেতে ওঠেন। সেকথা স্মরণ করে মোদীজী বলেছেন, 'আজ যখন সিঁদুর খেলার এই মাটিতে এসেছি, তখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের নতুন ভূমিকার কথা উঠে আসা স্বাভাবিক। আমাদের বোনেদের সিঁদুর ওরা মুছে দিয়ে ছিল। আমাদের সেনা ওদেরকে আমাদের সিঁদুরের শক্তি বুঝিয়ে দিয়েছে। আমরা সন্ত্রাসের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে, যা পাকিস্তান কল্পনাও করতে পারেনি। আমরা শক্তির পূজা করি। আমরা

মমতা ব্যানার্জি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যেভাবে ব্যক্তি আক্রমণ করলেন, তা নজিরবিহীন ও দুর্ভাগ্যজনক।

মহিষাসুরমর্দিনীর পূজা করি। অপারেশন সিঁদুর এখনোও শেষ হয়নি।'

এছাড়া এদিন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণের প্রসঙ্গও। তিনি বলেছেন— 'মালদা, মুর্শিদাবাদে যা হয়েছে, তা এখানকার শাসকদলের নির্মমতার দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একমাত্র আশ্রয় এখন আদালত। সব বিষয়ে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। আমি পশ্চিমবঙ্গের জনতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এভাবে সরকার চলে? এভাবে সরকার চলবে?'

অপারেশন সিঁদুরের প্রথম লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের ভিতরে থাকা জঙ্গিঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দেওয়া, যেখানে উগ্রপন্থীরা ভারত, তারা সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ, যেখানে গিয়ে কেউ তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনী সেইসব জেহাদি ট্রেনিং ক্যাম্পগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে। যা পাকিস্তান-সহ বিশ্বের কোনো দেশ স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি যে, ভারতের সেনার এত সাহস বা মোদীজীর ইচ্ছাশক্তি, যা বর্ডার থেকে ১০০ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে শত্রুদের জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে আসতে পারে। ভারত গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তানের পরমাণু হুমকি ফাঁকা আওয়াজ। এক ধমকে ভারত তা থামিয়ে দিতে পারে। আর চীনের কাছ থেকে যেসব দেশ যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার কথা ভাবছিল, তাদের কাছে ব্রহ্মোস মিসাইলের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

ঠিক এই সময় অভিযানের নামকরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যেভাবে ব্যক্তি-আক্রমণে গেলেন, তা নজিরবিহীন ও দুর্ভাগ্যজনক। প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, 'মহিলাদের সম্মান দিতে শিখুন। স্বামীরা স্ত্রীদের সিঁদুর পরিয়ে দেন। আপনি সকলের স্বামী নন। আগে কেন নিজের স্ত্রীকে সিঁদুর দিচ্ছেন না? ভোটের আগে তিনি সিঁদুর বেচেতে বেরিয়েছেন।'

প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর অযৌক্তিক ও

অশালীন আক্রমণের জন্য সাধারণ মানুষ মনে করছেন, আগামী বছর ভোটের বাক্সে কী ফল হবে তার জন্য তিনি সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর এই নগ্ন আক্রমণ।

অনেকেই মনে করছেন, মমতা ব্যানার্জির শাসনকালে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের উপরে যেভাবে তাঁর দুধেল গাইদের আক্রমণ হচ্ছে এবং তাঁর সরকারের পুলিশ ও প্রশাসনের সে বিষয়ে চুপ করে থাকা মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছেন না। এছাড়া তৃণমূল দলের সর্বনিম্ন স্তর থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত যেভাবে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তাও সাধারণ মানুষ ভালো চোখে দেখছেন না। এখন রাজ্যের মানুষের মনে একটাই ভাবনা এসেছে যে, আগামী বছর বিধানসভা ভোটে এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করবে তারা। রাজ্যের গরিষ্ঠ ভোটারদের এই মনোভাব মুখ্যমন্ত্রীর মতো বিচক্ষণ রাজনীতিকের বুঝতে বাকি নেই। তাই তিনি প্রায়ই সময় হতাশায় ভুগছেন আর বিরোধী বিজেপি দলের প্রথম সারির নেতাদের আক্রমণ করতে দ্বিধা করছেন না।

কেউ কেউ বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সিঁদুরে অ্যালার্জি হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা তিনি তো কোনোদিন সিঁদুর ব্যবহার করেননি বা কোনোদিন সিঁদুরের মর্মও বোঝেননি। উপরন্তু তিনি ক্ষমতা দখলের পর থেকে হিজাব, ইফতার, নমাজ, এমনকী ইনশাল্লাহ, মাশাল্লাহ প্রভৃতি ভাষা নিয়ে তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করে চলেছেন। তাই সিঁদুর শব্দ শুনলেই তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন।

প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের অপমান করলেন কীভাবে? প্রথমত অপারেশন সিঁদুর নামকরণ করেছে সেনাবাহিনী। সেনার এক কর্নেল অপারেশন সিঁদুরের লোগো এঁকেছেন। প্রধানমন্ত্রী তো সিঁদুরের শক্তি বোঝাতে অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গ তুলেছেন। এটা তো মহিলাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন। আর পশ্চিমবঙ্গে এসে অপারেশন সিঁদুরের কথা বলার অন্যদিকও আছে। এই পশ্চিমবঙ্গেই দুর্গাপূজার দশমী তিথিতে প্রতিমা ভাসানের আগে সিঁদুর খেলার চল রয়েছে। তাছাড়া সিঁদুর কেবল সাজসজ্জার অংশ নয়, এটি ভারতীয় নারীর গর্ব, আবেগ ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক। তাই সিঁদুরের মাহাত্ম্য পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা ভালোই বোঝেন।

এই সিঁদুরে আঘাত এলে ভারত কী করতে পারে, তা ইতিহাস জানে, বিশ্ব দেখেছে। তাছাড়া ভারত এখনো অপারেশন সিঁদুরের মধ্যেই আছে। প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়েছেন, এই অপারেশন এখনো শেষ হয়নি। ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে বড়ো মূল্য চোকাতে হবে বলে তিনি হুংকার দিয়েছেন।

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ইসলামি জঙ্গিরা যেভাবে ধর্ম নিশ্চিত করে বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের হত্যা করেছে, তারই উপযুক্ত জবাব গত ৭ মে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাকিস্তানের ন'টি স্থানের জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শতাধিক জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনী পালটা হামলা চালালে তারও জবাব দিয়েছে তাদের ১১টি বিমানঘাঁটি বিধ্বস্ত করে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও তাদের মারাত্মক ক্ষতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

তারও আগে উরি হামলার পর পাকিস্তানে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা এবং ২০১৯-এ পুলওয়ামায় ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের হামলার পর বালাকোটে ভারতীয় বায়ুসেনার প্রত্যাঘাতকে গোটা বিশ্ব সমীহ করলেও তৃণমূল দল তাকে বানানো গল্প বলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য তোষণনীতি এবং ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর প্রতি অবজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিহীনতার দিকটিকেই তুলে ধরে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক সংকট, এটি অভ্যন্তরীণভাবে ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক নীরব কিন্তু নির্লজ্জ যুদ্ধ। গণতান্ত্রিক পথে উত্থান হওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাহীন এবং ক্ষমাহীন নির্লজ্জ প্রতিপক্ষ। কেন্দ্রীয় আইনের প্রতি তাঁর বার বার অবজ্ঞা, বিচারবিভাগীয় ঘোষণার প্রকাশ্য উপহাস, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আশালীন ভাষায় বার বার আক্রমণ তাঁর স্বৈরাচারের এক বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে চলেছে।

ইসলামি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ভারত কড়া জবাব দিয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধীরা একবাক্যে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের কাকুতি-মিনতির জন্য সংঘর্ষ বিরতি হলেও ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে। শাসক দলের সঙ্গে বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধিরা দেশে দেশে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে অপারেশন সিঁদুরের ব্যাখ্যা করেছেন এবং সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। এই দলে মমতার ভাইপো তথা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আছেন। তিনিও ভারতের অপারেশন সিঁদুরের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। ঠিক এই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপারেশন সিঁদুর নামকরণের পিছনে রাজনীতির প্রশ্ন তুলে তিনি নিজেই প্রমাণ করলেন, সর্বক্ষেত্রে তিনি শুধু গঠনমূলক বিরোধিতার পরিবর্তে বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করেন। এটাই তাঁর প্রকৃতি। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশাসনে তিনি সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ রাজনীতিক, সেটাও প্রকাশ করে দিলেন। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় একটি ভয়ংকর অস্ত্র, 'হিন্দুরা ফ্যাসিস্ট আওয়ামি লিগের দোসর।' কাজেই তাদের ওপর হামলা করা যেতেই পারে।

যশোরের অভয়নগরে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ কীসের ইঙ্গিত?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ২২ মে রবিবার ২০২৫। যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার শান্ত নিরিবিলি ডহর মশিয়াহাটি গ্রাম। সন্ধ্যা নামছে বাড়েধা পাড়ায়। হিন্দু পল্লী, মহিলারা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালাবেন। তারই প্রস্তুতি। একটু পরেই কীর্তনের সুর ছড়িয়ে পড়বে। ঘরে ঘরে সন্ধ্যারতি। এটাই নিত্যদিনের কাজ। কিন্তু না, হঠাৎ অগুনতি পশুর দল ছুটে এলো, ঝাঁপিয়ে পড়লো নারকীয় উল্লাসে। নির্বিচারে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ। শিশুদের নিয়ে মায়েরা লুকানোর চেষ্টা করেও রেহাই মেলেনি। হিংস্র থাবা বিস্তৃত হয়েছে একের পর এক। মহিলাদের বাঁচাতে বড়োরা পশুদের রুখতে গিয়ে চাপাতি-সহ নানা অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন। ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা হিন্দু পল্লীতে। কান্না, আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে চারদিক।

'আমাদের অপরাধ কী?' ২৫ মে অবস্থা দেখতে গিয়ে এই প্রশ্নের মুখে পড়লাম। যখন শুনলেন সাংবাদিক, ক্ষোভে দুঃখে আবার প্রশ্নবাণ, 'আমরা হিন্দু বলেই এই অত্যাচার?' হামলার তিনদিন পর এদিন বিকেলে যখন ডহর মশিয়াহাটির হিন্দু পাড়ায় পৌঁছলাম তখনো তীব্র পোড়া গন্ধে নাক জ্বালা করছে। ২০/২১টি বাড়ির সবগুলোই ভস্মীভূত হয়েছে। পাড়া জুড়ে পোড়া বিছানাপত্র, আসবাব, কোনো কোনো ঘরে টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোটর সাইকেল, সাইকেল, রান্নার ব্যবহার্য জিনিসপত্র। ভাঙচুরের পর আগুন দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি বাড়িতে হারমোনিয়াম, তবলা, ডঙ্কা দেখলাম, পুড়েছে। পুড়েছে বইপত্র। পুড়েছে ধান চাল। অধিকাংশ বাড়ির উঠোনে পোড়া ধানের স্তূপ দেখা গেল। তখনো ধানের আগুন নেভেনি। জেহাদিরা আগুন দেওয়ার আগে সোনাদানা, টাকাপয়সা লুট করে। প্রশ্নের উত্তরে কয়েকজন মহিলা জানালেন, আগুন দেওয়ার আগে সাদা পাউডার ছিটাতে দেখেছি। সবচেয়ে ভয়ংকর কথা শুনলাম, খবর পেয়ে দমকল ছুটে আসছিল আগুন নেভাতে, কিন্তু বিএনপির নেতা-কর্মীরা দমকলের গাড়ি আসতে দেয়নি।

এলাকার মানুষজন মতুয়া সম্প্রদায়ের। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সর্বদা পালন করে। বাড়েধা পাড়ায় ঢোকার মুখে দেখলাম একটি বাড়িতে ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন কীভাবে জেহাদিরা পণ্ড করে দিয়েছে। তিনদিন ধরে উৎসব হওয়ার কথা ছিল। অনেক দূর থেকে কয়েকটি কীর্তনের দল এসেছিল, সমবেত হয়েছিলেন ভক্তরাও। প্রসাদের নানা সামগ্রী, ভাঙা খোল-করতাল, ডঙ্কা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম।

গোটা পাড়া পুরুষশূন্য। এক বৃদ্ধ, যার মাথায় তখনো ব্যান্ডেজ বাঁধা। বললেন,

বাবা, একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এই রকম হামলা দেখিনি। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন রাখলেন, আমরা কি এদেশে থাকতে পারবো? এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই।

জানলাম, গ্রামে পিন্টু বিশ্বাসের বাড়িতে স্থানীয় মাছের ঘের নিয়ে একটি বৈঠক বসেছিল বিকেলে। ভবদহ বিলের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধ এলাকায় প্রায় তিনশো বিঘা মাছের ঘের গত বছর কথিত বিপ্লব পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতেন আওয়ামি লিগ নেতা চিকন মিয়া। তিনি এখন পলাতক, ঘেরের কর্তৃত্ব নিচ্ছেন বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) নেতা তরিকুল ইসলাম। শেখ হাসিনা গত বছর ৫ আগস্ট দেশত্যাগের পর থেকে এখানে বিএনপির দাপট, ভাবখানা তারাই আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসবেন। পিন্টু বিশ্বাসের বাড়িতে এই কর্তৃত্ব বদলের বৈঠক বসেছিল। কিন্তু তরিকুলের প্রতিপক্ষ (তারাও বিএনপিরই লোক) চাইছিল মাছের ঘেরের কর্তৃত্ব নেবেন তারা। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। বৈঠকে তরিকুলের পক্ষে সব কাগজপত্র তৈরির শেষ পর্যায়ে প্রতিপক্ষের বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তরিকুল। তার সঙ্গীরা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে প্রচার করেন, হিন্দু বাড়িতে এসে আমাদের নেতা তরিকুল ইসলাম খুন হয়েছেন। মোবাইল ফোনে বার্তা পাঠানো হয়। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শত শত মোটর সাইকেলে সশস্ত্র বিএনপি নেতা-কর্মীরা ছুটে এসে, ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দু পল্লীর ওপর। এই মানুষগুলোর দোষ কী? জবাব মেলেনি।

তবে হ্যাঁ, নানা স্তরে বিশেষ করে যশোর জেলার হিন্দু নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, ডহর মশিয়াহাটির প্রধান সড়কের দুপাশে বিস্তৃত বাড়েধা হিন্দু পাড়ার এই জমির দাম বাড়ছে প্রতিদিনই। অসহায় এই মানুষগুলোকে তাড়াতে পারলে প্রচুর জমি পাওয়া যায়। লোভ দানা বেঁধেছে দীর্ঘদিন ধরে। গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর স্বপ্নপূরণে অতি উৎসাহী হয়ে ওঠে তরিকুলরা। হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় একটি ভয়ংকর অস্ত্র, 'হিন্দুরা ফ্যাসিস্ট আওয়ামি লিগের দোসর।' কাজেই তাদের ওপর হামলা করা যেতে পারে। তরিকুল হত্যার ঘটনা অস্ত্র তুলে দিয়েছে তাদের হাতে।

যশোরের অভয়নগর, মণিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলা মোটামুটি হিন্দু অধ্যুষিত। ১৯৪৭ সালে যশোরের এই বিস্তীর্ণ এলাকা এবং সন্নিহিত খুলনার ফুলতলা ও ডুমুরিয়া জুড়ে ৯৬টি গ্রাম ছিল পুরোপুরি হিন্দু অধ্যুষিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে গ্রামগুলো ধীরে ধীরে হিন্দুশূন্য হতে থাকে। সেই পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বর্তমান সময়ে জনবিন্যাস ব্যাপক পরিবর্তিত হলেও এই অঞ্চলে হিন্দুরা বড়ো সংখ্যায় এখনো রয়ে গেছে। এবং আর্থিকভাবে তারা মোটামুটি স্বচ্ছল বলা যায়।

ডহর মশিয়াহাটি গিয়ে দেখা গেল মানুষগুলো দারুণ পরিশ্রমী, ক্ষেতের ফসলে তাঁদের বছর চলে যায়। চাষাবাদ ছাড়াও নানা জীবিকায় ব্যস্ত থাকেন তাঁরা। অনেক পরিবারের সদস্যরা বাইরে চাকরিবাকরি করেন। শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে। অনেক মেয়ে উচ্চ শিক্ষার দরজা পেরিয়েছে। অধিকাংশ বাড়িঘর পাকা কিংবা আধা-পাকা। এলাকার এক সাংবাদিক জানালেন, সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যায় কীর্তনের আসর বসতো। কিন্তু এই নারকীয় হামলা তাদের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে তারা কেউ জড়িত নয়। ভোট এলে দল বেঁধে ভোট দিতে যান।

এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ মতুয়া ধারার। এই ধারা আবার দুভাগে বিভক্ত। এক ধারায় নেতৃত্ব দেন পদ্মনাভ ঠাকুর, অন্য ধারার নেতৃত্বে সুব্রত ঠাকুর। তবে পদ্মনাভ ঠাকুরের অনুসারী বেশি বলেই জানালেন এক হিন্দু নেতা। তবে সর্বস্ব হারানো বাড়েধার মানুষ ক্ষুব্ধ এই কারণে যে, এই হামলার পর পদ্মনাভ ঠাকুর কিংবা সুব্রত ঠাকুর কেউ তাদের দেখতে আসেননি।

সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হচ্ছে, তরিকুল ইসলাম হিন্দু বাড়িতে নিহত হয়েছেন, এ কারণে গোটা পাড়ার হিন্দুদের হত্যা মামলায় জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ফলে গোটা পাড়া পুরুষশূন্য হয়ে গেছে। তারা আত্মগোপন করেছেন। আমি পাড়ায় মাত্র একজন বয়স্ক পুরুষকে পেয়েছি। মহিলারা অসহায়, সাহায্য-সহায়তার ওপর নির্ভর করছে তাদের খাওয়া-দাওয়া। জামা-কাপড় ছিল না। কয়েকটি সংগঠন সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসায় তাদের লজ্জা নিবারণ হচ্ছে। একটি মোটামুটি সমৃদ্ধ পাড়া কীভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হলো যশোরের এই গ্রামটি তার সাক্ষ্য বহন করছে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় থাকাকালে নির্বাচনের পর এই অভয়নগর ভয়াবহ হামলার শিকার হয়েছিল। তারপরও গ্রামের মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এবার তারা ধ্বংসের মুখে দাঁড়ালেন।

এই প্রতিবেদন লিখছি ৩ জুন। এই সময় খবর পাওয়া গেল পটুয়াখালী শহরে হিন্দুদের পাঁচটি বাড়ি রাতে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা হয়েছিল। বার্তা সংস্থা জানাচ্ছে, বাড়ির মানুষগুলো নিঃস্ব হয়ে পথে দাঁড়িয়েছে। জায়গাজমি দখলের লক্ষ্যেই এই অগ্নিসংযোগ বলে প্রাথমিক খবরে বলা হয়েছে। □

With Best Compliment From -

A Well Wisher

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই কিন্তু শান্তির জন্যে যুদ্ধ চাই

সন্ত্রাসবাদীরা নিজেরাই আতঙ্কে থাকে। তাই তাদের সবসময় কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা থাকে। তারা মুখ দেখাতে ভীষণ ভয় পায় যদি জনগণ দেখতে পায়, যদি ধোলাই দেয়। রাতের অন্ধকারে, কখনো-বা দিনের বেলায় চোরদের মতো পাকিস্তান থেকে এসে কাশ্মীরে নিরীহ পর্যটকদের উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে যা ঘটেছিল আমাদের সকলের জানা, হাড় হিম করা সেই সন্ত্রাসের কথা। ২৬ জন হিন্দুকে বেছে বেছে গুলি করে হত্যা। এক বর্বর জাতির বর্বরতার কথা সারা পৃথিবী জেনে গিয়েছে। বর্বরতার ধারাবাহিকতার ইতিহাস থেকে তারা বেরোতে পারে না। তারা সভ্যতার অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তাদের না আছে বিজ্ঞান, না আছে উন্নত সভ্যতা। মরুভূমির ডাস্টবিন থেকে তারা বের হতেই চায় না। সারা পৃথিবীতে ঘৃণ্য তারা। ঘৃণ্য জাতি সত্তার অধিকারী হয়ে, কলঙ্ক নিয়ে তারা বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। তারা বিশ্বে কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করেছে। মানবতাকে তারা ভালোবাসতে শেখেনি। ঘৃণাকে তারা ভালোবাসে। মাদ্রাসায় তাদের মগজ ধোলাই হয়। এই জেহাদিরা আলো দেখতে ভয় পায়।

অসুন্দর কখনো সুন্দরের পূজারি হতে পারে না। তাই তারা মঠ, মন্দির, গ্রন্থাগার, শিল্প-কলা-সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ধ্বংস করতে ভালোবাসে। মানবতা বিরোধী শত্রুর নাম এই ইসলামিক জেহাদি। যারা অশান্তি চায়, তারা কখনো শান্তি চায় না। তারা ধর্মের নামে পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলেছে। তাই ভারত সরকার সঠিক কাজ করেছে। পাকিস্তানকে দুরমুশ করে দিয়েছে। জঙ্গির মদতদাতা তারা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, কিন্তু শান্তির জন্যে এমন আঘাত বার বার চাই। পাকিস্তান তো শিক্ষা পেল, কিন্তু যারা ভারতের ভিতরে থেকে পাকিস্তানকে সমর্থন করছে তাদের কী হবে? বিশেষ করে যারা পাকিস্তানের স্লিপার সেল হয়ে কাজ করছে? যারা সর্বদা ভারত বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে?

এই জেহাদিরা সর্বদা ঘৃণার বিষ ছড়িয়ে চলেছে পৃথিবীতে। তারা নিজ মজহব নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, তারা অন্যের ধর্মকে আঘাত করতে সদা ব্যস্ত থাকে। নিজেদের মজহব অন্যের উপর জোরপূর্বক চাপাতে চায়। তাই নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেছেন, যতদিন ইসলাম থাকবে ততদিন সন্ত্রাসবাদ থাকবে। এরা মসজিদে বসে মানুষ মারার ষড়যন্ত্র করে। পবিত্র স্থান অপবিত্র করে আল্লার নামে। এরা দ্বিজাতিতত্ত্বের নামে দেশ ভাগ করেছে। এখন হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণে নির্বাচন হচ্ছে, তবুও সেকুলারিজমের মুখোশ পড়ে থাকা নেতা-নেত্রীরা এদের সমর্থন করে। এই মেকি, ফেক, সিউডন সেকুলারিজম কখনো ভারতের হিতসাধন করতে পারে না। এদের উসকানি দেওয়ার ফলে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা যাচ্ছে। তাই এমন ভ্রান্ত তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে না থেকে তথাকথিত এই সেকুলারিজম সংবিধান থেকে তুলে দিতে হবে, তবে দেশ বাঁচবে, দেশের মঙ্গল হবে।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

শত ক্ষতবিক্ষত হয়েও সনাতন ধর্মের অগ্রগতি অব্যাহত

ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে কত ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে আমাদের সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম। যেমন—সুলতান মামুদের বহুবার আক্রমণে ভারতের বহু মন্দির লুণ্ঠিত হয়েছে। আবার বাবুরের আক্রমণে রামমন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। রাজা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে বাবর আহত হয়, পরে যুদ্ধে তার মৃত্যু ঘটে। তাঁর আগে মির বাকি খাঁকে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। মহাত্মা শ্যামানন্দকে সে সময় অযোধ্যা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সে সময় রাজা মহাতাপ সিংহ মন্দির উদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং নিহত হন। ক্ষত্রিয় বংশীয় রাজা দেবীদীন পাণ্ডে মন্দির পুনরুদ্ধারে যুদ্ধ করেন এবং ৫ দিন যুদ্ধের পর নিহত হন। এরপর হংসবরের রাজা রণবিজয় সিংহ চেষ্টা করেন এবং ১০ দিন যুদ্ধ করে নিহত হন। রণবিজয়ের পত্নী জয়রাজ কুমারী মহিলাদের একত্রিত করে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। জয়রাজের মহেশ্বরানন্দজী সন্ন্যাসী ও রামভক্তদের নিয়ে যুদ্ধে শামিল হন। মহেশ্বরানন্দজীর মৃত্যুর পর স্বামী বলরাম আচারী বার বার সৈন্য সংগ্রহ করে মন্দির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যান।

পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক পুনরাক্রমণ এবং প্রয়াগের মহল্লা ঘাটের পরশুরাম মঠের মহন্ত স্বামী রামানন্দ দাসের নেতৃত্বে ৩০ বার যুদ্ধ হয়। এর পর আবার ১৮৫৩ সাল থেকে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৮৫৭ সালে ইংরেজের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে যুদ্ধ করে। এই মহাসংগ্রামের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করে ব্রিটিশরা ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি গ্রহণ করে। সেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ডাইরেক্ট অ্যাকশনে, হিন্দু নিধনে, দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। সেই হিংসা আজও প্রজ্বলিত। অতি সম্প্রতি কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে হিন্দু পর্যটকদের বেছে বেছে, সিঁদুর পরা রমণীদের স্বামীদের হত্যা নির্মমতার ইতিহাস। অনুরূপভাবে মুর্শিদাবাদ ও মালদার হিন্দু হত্যা, অগ্নি সংযোগ ও নানা নির্যাতন, এ এক সন্ত্রাসের রাজত্ব।

ভারতের বীর সেনারা দিয়েছে যোগ্য জবাব। পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে বিশ্বের ৩৩টি দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে ভারত।

পশ্চিমবঙ্গে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ এবং পহেলগাঁওয়ে কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি বিরোধী দলগুলো নানা অমানবিক

মন্তব্য করে চলেছে। তারা বলছে মোদী চায়ের ব্যবসা করেছেন, এখন সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। প্রশ্ন এসে যায়, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিশ্বখ্যাত আব্রাহাম লিংকন ছিলেন একজন গরিব কাঠুরিয়ার সন্তান, এটা তো বর্তমান গণতান্ত্রিক সভ্যতার গৌরব। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটসর্বস্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ধর্ম নিয়ে নাটকের শ্যুটিং, দুধেল গোরুর লাথি, অন্যদিকে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির, আবার রামনামে রেগে তেড়ে আসা। আবার রামপূজা করে প্রসাদ বিতরণের ঘনঘটা। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরোধিতা এরা করেছে। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্র সরকারের আমলে ৩৭০ ধারা বাতিল করা সম্ভব হয়েছে। কাশ্মীরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হিন্দু বা সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার। চাকরিতে যারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, জাতির মেরুদণ্ড বলা হয় যে শিক্ষকদের, তাঁরা হয়েছেন চাকরি হারা। এরাজ্যে সব কিছুতেই দুর্নীতি। এ এক অন্ধকারময় রাজনীতি। আবার ঘটছে গণতান্ত্রিক লজ্জা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর সভায় যেতে বাধা, রাস্তায় গাড়ি ভাঙ্গা, মারধর। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ দর্শন, সনাতন ধর্মের অহিংস আন্দোলন, ন্যায়ধর্ম বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো মানব ধর্ম। সনাতন বা হিন্দুধর্ম ক্ষতবিক্ষত হয়েও, তার দর্শন আজও বিশ্বনন্দিত অহিংস দর্শন। হিন্দুধর্ম যুদ্ধ নয়, বুদ্ধের পূজারি।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা,
কোচবিহার।

জিয়াকে আমি যেভাবে দেখেছি

প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হন ৩০ মে, ১৯৮১। আমি তখন ঢাকায় দৈনিক সংবাদে। নাকি দৈনিক বাংলার বাণীতে চলে এসেছি ঠিক মনে নেই? সারাদেশ সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, এমন নৃশংস মৃত্যু কারও কাম্য নয়। গুজব রয়েছে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। এর পেছনে কারণ হচ্ছে তদীয় পত্নী বেগম জিয়াকেও মৃতদেহ দেখতে দেওয়া হয়নি। জিয়া নৃশংসভাবে প্রচুর মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম সামরিক শাসক। মুক্তিযোদ্ধা হয়েও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিকে রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। গোলাম আজমকে দেশে ফিরিয়ে এনেছেন। রাজাকার শাহ আজিজকে তল্পিবাহক প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন। রাজাকারের গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম তার আমলেই শোভা পায়।

আজকে বাংলাদেশের মোল্লাবাদের যে উত্থান ঘটেছে এর জন্মদাতা জিয়াউর রহমান। তিনি 'জেড ফোর্সের' প্রধান থাকলেও মুক্তিযুদ্ধকালে মূলত গৃহবন্দি ছিলেন। জিয়ার ওপর মেজর রফিকের একটি বই আছে, পাঠক সেটি পড়ে দেখতে পারেন। জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন না, তিনি বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। এটি আমার নিজকানে শোনা কথা, আমি যা শুনেছি, তাই লিখছি। খুব সম্ভবত ২৮ মার্চ ১৯৭১-এ চাঁদপুরে বসে আমরা এ ঘোষণা শুনি। অবশ্য তার এ ঘোষণা জাতিকে উৎসাহিত করেছে। জিয়া জীবদ্দশায় কখনো বলেননি যে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। জিয়া শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' বলতেন। একদা বিখ্যাত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় তার একটি বিশাল সাক্ষাৎকার আছে। জিয়া ছিলেন ধূর্ত, বঙ্গবন্ধু হত্যায় তিনি জড়িত ছিলেন। জিয়াউর রহমান দিবারাত্রি একটি কালো চশমা পরতেন। আমার বহু লেখায় আমি প্রশ্ন করেছি, কেউ কি আমায় খোলা চোখে জিয়ার একটি ছবি দেখাতে পারবেন? না পারলে নিজেকে প্রশ্ন করুন, কেন নেই? তাঁর করুণ মৃত্যু তার কর্মফল। তার জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছিল। এর সুফল হিসেবে বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, যদিও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

এরশাদ পরোক্ষভাবে জিয়া হত্যায় জড়িত ছিলেন। সব প্রকাশ হবার ভয়ে তাই তিনি চৌকস সেনা অফিসার হিসেবে পরিচিত জেনারেল মনজুরকে বাঁচিয়ে রাখেননি। তাকে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কে গুলি করে হত্যা করা হয়। জিয়ার আমলে বাংলাদেশে প্রথম গণভোট হয় এরপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। গণভোটে জিয়া মোট ভোটের চেয়ে বেশি ভোট পান, যদিও তা পরে সংশোধিত করা হয়। জিয়ার আমলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিল সামরিক কায়দায়। বাংলাদেশে ভোট কারচুপির তিনি জনক। 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবোধ' নামক উদ্ভট দর্শনের প্রবক্তা তিনি। এ সম্পর্কে প্রফেসর ড. হুমায়ুন আজাদ সবচেয়ে মূল্যবান কথাটি বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সাম্প্রদায়িকতাকে ভদ্রোচিত করার জন্যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবোধের সূচনা'। হ্যাঁ, জিয়া বাংলাদেশে মজহবভিত্তিক রাজনীতির প্রবক্তা।

জিয়াভক্তরা প্রায় সবাই সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িকতা এদের রক্তে। হয়তো এখন থেকে একশো বছর পর বাংলাদেশের যে ইতিহাস লেখা হবে, তাতে জিয়া 'মিরজাফর' হিসেবে চিহ্নিত হবেন। জিয়ার সৃষ্টি বিএনপি। ক্ষমতায় থেকে জিয়া এই দল গঠন করেন। তবে প্রথমেই এটি বিএনপি ছিল না। কয়েকদফা নাম পরিবর্তন করে শেষমেশ একটি ভদ্রোচিত নাম 'বিএনপি' হয়েছে। ষড়যন্ত্রের মধ্যে জন্ম নেওয়া দলটি আজও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। পারলে এই দলটির এখন ক্ষমতায় থাকার কথা। প্রেসিডেন্ট জিয়াকে আমি দেখেছি, খাল কেটে তিনি কুমির এনেছেন। সাম্প্রদায়িকতা নামের সেই কুমির এখন দেশকে গিলে খাচ্ছে। 'খাল খনন' ছিল জিয়ার একমাত্র সফল কর্মসূচি, যার মাধ্যমে তিনি দুর্নীতিকে সরকারীকরণ করেছিলেন। জিয়া ছিলেন গণতন্ত্র হত্যাকারী এবং জেনারেল আয়ুব খানের প্রেতাত্মা। পাকিস্তানপন্থী রাজনীতির তিনি জনক। আজকের এনসিপি বা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার অবশ্য পাকিস্তান-প্রেম, ভারত-বিরোধিতা, স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে বিএনপি-কে পেছনে ফেলে দিয়েছে। জিয়ার আমলে বাংলাদেশের মানুষ 'জয়বাংলা' স্লোগান দিতে পারতো না। বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়া বারণ ছিল। এখনকার মতো সবকিছুই ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত। জিয়া বাংলাদেশের প্রথম স্বৈরশাসক ছিলেন।

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে মহিলাদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

গ্রাম বা শহর যেখানেই আমরা বসবাস করি, সেখানেই গড়ে তুলতে পারি ছোট্ট একটি বাগান। গ্রামে সাধারণত সব বাড়ির লাগোয়া বেশ খানিকটা জমি থাকে। সেখানে বাড়ির লোকজন তুলসীগাছ ছাড়াও ফুল, ফল, শাকসবজির গাছ লাগিয়ে থাকেন। তাঁরা যেসব গাছ লাগান, সেগুলির সঙ্গে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন; যেমন ফুলগাছ পূজার এবং বাড়ির শোভাবর্ধনের কাজে লাগে; ফল, শাকসবজি খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। শহরের বাড়িগুলিতে আবার তুলসীগাছ ছাড়াও ঘর সাজানোর গাছের প্রাধান্য চোখে পড়ে। বেশ কিছু বিদেশি গাছ কবে যেন আমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে। এপ্রসঙ্গে বলা যায়, শহরে ফ্ল্যাট বাড়ির যে-কোনো জায়গাতে একটু যত্ন নিলেই আমরা গ্রামের মতোই খাদ্যরূপে ফল, সবজি গাছও লাগাতে পারি। সেগুলিতে কয়েক মাসের মধ্যেই ফলন পাওয়া যায়। সেজন্য, কেবলমাত্র সুন্দর দেখতে বিদেশি গাছের পরিবর্তে দেশি ফুল, ফল, শাকসবজি লাগানোর কাজেই মন দেওয়া ভালো। বর্তমানে মাটি, সার সবকিছু বাজারে পাওয়া যায়। বাড়িতে ব্যবহৃত চা-পাতা, তরকারির খোসা, ডিমের খোলা ইত্যাদি খুব ভালো সার। শুরুতে আমরা এমন কিছু গাছ লাগাতে পারি, যা সহজেই হয়। বেশ কয়েক প্রকার তুলসীগাছ যেন অবশ্যই আমাদের সকলের বাড়িতে থাকে। এর গুণাবলী প্রশ্নাতীত। ফুলের মধ্যে যেমন— নয়নতারা, বেল, জবা, কামিনী, শিউলি ইত্যাদি ঔষধীয় গুণেও পরিপূর্ণ। এছাড়া নিম, পেয়ারা, সবেদা, আম, কারিপাতা, পুদিনাপাতা, থানকুনি, ধনেপাতা, লাউ-কুমড়ো, উচ্ছে, টম্যাটো, কাঁচালঙ্কা, পুঁই, পালং, নটেশাক ইত্যাদি আমরা মহিলারা রান্নার প্রয়োজনমতো অনেকটাই আমাদের বাড়ির বাগান থেকে পেয়ে যেতে পারি।

বাড়িতে ছাতে, বারান্দায়, উঠানে এই গাছগুলি পরিবেশকে শুদ্ধ ও শীতল করে। বাড়ির সদস্যরা বিশেষ করে মহিলারা দৈনিক পনেরো মিনিট থেকে আধঘণ্টা এগুলির পরিচর্যা করলে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেকটাই ভালো থাকা যায়। বাড়ির ছোটোরা অর্থাৎ নতুন প্রজন্মকেও এর সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। বাড়ির টাটকা ফল, সবজির প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়াতে মায়েদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতি ও নারী পরস্পরের মধ্যে খুবই নৈকট্য অনুভব করেন। বাড়ির সদস্যরাও ধীরে ধীরে এই প্রচেষ্টাতে যুক্ত হলে টিভি, মুঠোফোন, কম্পিউটারের অনাবশ্যক ব্যবহার কম হবে, শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধন হবে। কীটনাশক ও রাসায়নিক প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজ হাতে তৈরি ফল, সবজির স্বাদ আস্বাদন করতে পারব।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রজাতির বিদেশি গাছে আমাদের বাড়িঘর ভরে যাচ্ছে। বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমেও এই গাছগুলির ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। বিভিন্ন প্রকার পাম, ছোটো বাঁশ, ইউক্যালিপটাস, পাতাবাহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কতটা কার্যকরী সে বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মহিলারা স্বভাবত অনেক বেশি সচেতন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, কোনো গাছগুলি লাগাবেন এবং পরিচর্যা করবেন। আষাঢ়-শ্রাবণ মাস থেকে চারদিকে ব্যাপকভাবে গাছ লাগানো হয়ে থাকে। পরিবেশ রক্ষায় গাছ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখনো রথের মেলায় প্রচুর গাছ বিক্রি হয়। মেলা থেকে আমরা দেখেশুনে কিছু গাছের চারা কিনে আনতে পারি। যেগুলি পারম্পরিক এবং আমাদের নিজস্ব, সেগুলি বাড়ির শোভাবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরের পুষ্টি এবং মনের শান্তি প্রদান করে। বিদেশি গাছগুলি অনেক ক্ষেত্রে উর্বর মাটিকে অনুর্বর করে তোলে। অনাবশ্যক প্রচুর জল শোষণ করে। সেজন্য, বাড়িতে যেসকল শাকসবজি নিয়মিত রান্না হয়, সেগুলি আমরা অনায়াসে নিজেরাই করে নিতে পারি। একজন সচেতন মা-ই পারেন সমগ্র পরিবারকে সুস্থ রাখতে। বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের এক-একটি গাছের দায়িত্ব দিলে, তারাও গাছ তথা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবে। মাটির মূল্য জানতে শিখবে, মাটিকে, পৃথিবীকে ভালোবাসতে শিখবে।

প্রকৃতি আমাদের মা। সেই মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে, একাত্মতার অনুভব করতে হবে। প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে, সম্মান জানাতে হবে। আমাদের বাসস্থানটি যেন প্রকৃতি-বান্ধব হয়। অথর্ববেদের পৃথ্বী সূক্তে প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্বন্ধে নির্দেশাদি আছে। আমরা যেন সীমিত, সংযমী, সদাচারী জীবনশৈলী অনুসরণ করি। আমরা মহিলারা স্বভাবতই পরিশ্রমী ও অনুভবী; সুতরাং নিজেদের আচরণ ও জীবনশৈলীর মাধ্যমে যতটা সম্ভব পরিবারের স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির যথাযথ সেবা করার চেষ্টা করি। ▯

ফুসফুসের ক্যানসার প্রয়োজন সচেতনতার

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

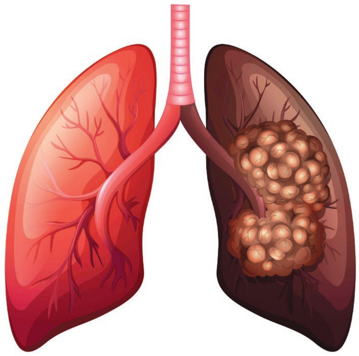

মানুষের শরীরের আপাদমস্তক প্রায় প্রত্যেকটা অঙ্গেই ক্যানসার বা কর্কট রোগের আক্রমণ হতে পারে। একেকটা ক্যানসারের লক্ষণ একেক রকম। আমরা এই নিবন্ধে আমাদের ভাবনাচিন্তা কেবলমাত্র ফুসফুসের ক্যানসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো। এই প্রসঙ্গে একটি জার্নালে প্রকাশিত পুরাতন পরিসংখ্যানটি দেখা যাক। তাতে করে এই রোগের ভয়াবহতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যেতে পারে। বলাই বাহুল্য যে এখন চিত্রটা আরও বেশি কঠিন রকমের জটিল। নানাবিধ অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা উপলব্ধ হলেও সেই ক্যানসার নামক নীরব ঘাতক দানবকে আমরা বাগে আনতে পারিনি।

পরিসংখ্যান কী বলে? ১৯৯০ সালে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৯.৩ মিলিয়ন মহিলা ও পুরুষ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্যানসার ছিল ফুসফুসের। তাই ফুসফুসের ক্যানসারের গুরুত্বটা সমধিক। উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশে এই রোগের প্রকোপ বেশি এবং সব রকমের ক্যানসারের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানে এই রোগ মহিলাদের মধ্যে বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেছে। ১৯৪০ সালে মহিলাদের মধ্যে এই রোগের হার ছিল প্রতি লক্ষে সাত জন। এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি লক্ষে ৪২ জনেরও বেশি।

ধূমপানের সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক : প্রায় ১.১ মিলিয়ন ধূমপায়ী প্রতিবছর ছ' হাজারের বেশি সিগারেট টেনে থাকেন। এটা নিশ্চিতভাবে জোর দিয়ে বলা যায় এই প্রবণতা যদি না বদলায় বা রোধ করা না যায়, তবে এই রোগ মহামারির আকার নিতে পারে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে হারে ধূমপানের নেশা বেড়ে চলেছে, হিসেব মতো ২০২৫ সালে ধূমপান জনিত কারণে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক মারা পড়বেন। এবং এই মৃত্যুর কারণগুলির মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসার সিংহভাগ দখল করে থাকবে।

সুতরাং এটা আর আলাদা করে বলা প্রয়োজন নেই যে, ধূমপানই হচ্ছে ফুসফুসের ক্যানসারের প্রধান কারণ। ধূমপায়ীদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ অ-ধূমপায়ীদের চেয়ে নয়গুণ বেশি। কত দিনে এই রোগ সৃষ্টি হবে, সেটা নির্ভর করে কত বেশি সময় ধরে এবং কত বেশি সংখ্যায় ও পরিমাণে ধূমপান করা হচ্ছে বা হয়েছে তার ওপরে। সুখবর এই যে, ধূমপান বন্ধ করলেই এই রোগের সম্ভাবনার ঝুঁকি নিশ্চিতভাবে কমে যায়। দেখা গেছে, প্রায় ছয় বছরের বেশি সময় লাগে এই রোগের প্রবণতা কমতে। আজকে ধূমপান ছাড়লে, কাল থেকে ঝুঁকি কমে গেল। ব্যাপারটা সেই রকম কিছু নয়।

পুরুষরা সাধারণত ৬০ থেকে ৬৫ বছর বয়সে এবং মহিলারা ৭০ বছরের বেশি বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হন। যেসব পুরুষ ও মহিলা ধূমপান করেন না অথচ ধূমপায়ীদের সঙ্গে থাকার কারণে পরোক্ষভাবে ধূমপান করতে বাধ্য হন, তারাও এই ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন। পরোক্ষ ধূমপায়ীর মুখ নির্গত ধোঁয়ার প্রভাবে পড়েন, তাদের এই রোগের প্রকোপ কিছুটা কম।

১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সের মধ্যে যারা ধূমপান আরম্ভ করে এবং এই নেশা ত্যাগ করতে পারে না, তাদের দুই জনের মধ্যে একজন ভবিষ্যতে এই রোগে আক্রান্ত হবে। অতএব তামাক খোরেরা সাবধান।

অন্যান্য কারণেই ঝুঁকি : ধূমপান ছাড়াও আরও অনেক কারণে এই রোগ হতে পারে। যেমন— ১. তেলের ফার্নেসে যারা কাজ করেন। ২. বিভিন্ন জ্বালানির ধোঁয়া গ্রহণ। ৩. যারা অ্যাসবেস্টস নিয়ে কাজ করেন। ৪. সব রকমের পরিবেশ দূষণ গ্রামের চাইতে শহরে এই রোগের প্রকোপ বেশি। শহরে যানবাহন চলাচল ও কলকারখানা বেশি। ৫. ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, বেরিলিয়ম, কোবাল্ট সেরোনিয়াম— এই সব ধাতু দিয়ে যারা কাজ করেন। ৬. রাসায়নিক পদার্থ যেমন প্রো-মিথাইল ইয়ার নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা প্রবল।

বংশগত কারণ : আরও একটা তথ্য জানা গেছে। পরিবেশ দূষণ জনিত ফুসফুসের ক্যানসারের তুলনায় বংশগত ফুসফুসের ক্যানসার আরও বেশি করে ঘটে এবং সেটা মারাত্মক।

মৃত্যুহার : ফুসফুসের ক্যানসারের রোগীকে যত ভালোভাবেই চিকিৎসা করা হোক না কেন, প্রতি দশজন আক্রান্তের একজন মাত্র রোগী তিন বছরের বেশি বেঁচে থাকেন।

প্রতিরোধ : এই রোগ থেকে রক্ষা এবং রেহাই পেতে গেলে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ক্যানসার প্রতিরোধের ব্যাপারে সতেনতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেই হবে। ছোটোবেলা ধূমপান করার প্রবণতা তৈরি হওয়ার কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা ধূমপান করেন, এই সম্মুখ উদাহরণটা বিপজ্জনক। এছাড়া বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে, আত্মবিশ্বাস এবং বড়ো হয়ে গেছি এই ভাব এবং প্রাণবন্তভাব অনুভব করার জন্য এবং আরও পূর্ণ বয়স্কতা লাভের আশায় ছোটোরা ধূমপানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেকের মনে হয়, বিশেষ কায়দায় সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে বেশ সপ্রতিভ দেখায়। বয়ঃসন্ধির এই সব মানসিক কুপ্রভাব থেকে ছোটোদের মুক্ত করতে হলে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। □

শুধু বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি নয়, আজ বিশ্ববন্ধু ভারত

অরিন্দম ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষের চাণক্য বিশ্ববাসীকে শিখিয়েছিলেন অর্থনীতি, কূটনীতি ও প্রশাসনিক নীতি। শোনা যায় ৭০০-৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ দিত বিশ্বের ৪৮ শতাংশ জিডিপি। তখন ছিল জ্ঞান, মেধা, শিল্প-বাণিজ্য ভরা এক সুজলা সুফলা দেবভূমি ভারত। লুঠেরা মরুদৈত্য থেকে পর্তুগিজ, চীন, ব্রিটিশ, কেজিবি, কমিউনিস্টদের অত্যাচার, ধর্মান্তরের বীভৎস ইতিহাসে ধ্বংস হয় সেই ভারত। হাজার বছর পরাধীন থাকে ভারত। তারপর শুরু হয় আবার উত্তরণ। ভারত আজ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হচ্ছে এটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হলো :

(১) ভারতে ৩০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে গত ১০ বছরে। বিভিন্ন মিডিয়ায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘও এই বিষয়টি স্বীকার করেছে। (২) এক দশক আগেও ৯৫ শতাংশ প্রতিরক্ষা আমদানি করত ভারত। তা আজ ২৭ শতাংশে নেমে এসেছে। ভারত আজ ইজরায়েল, আর্মেনিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন্স, গ্রিসকে অস্ত্র বিক্রি করছে। ভারতের প্রায় ২০০টি সংস্থা ও ৩৫০ টি প্রতিরক্ষা স্টার্ট আপ কোম্পানি ড্রোন, এআই, হাইপারসনিক ফুয়েল ইত্যাদি বিক্রি করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিদেশি মুদ্রা বাণিজ্যে চীন-রাশিয়া-আমেরিকা- ইউরোপ-ইজরায়েলের সঙ্গে পাল্লা দেবে ভারত। (৩) শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির, চন্দ্রযান, কোভ্যাকসিন-সহ ব্রহ্মোস, অগ্নি, কালী, দুর্গা-২ ইত্যাদি অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বানাচ্ছে আজকের ভারত। (৪) ভারতের যুদ্ধবিমানগুলি ১০ মিনিটে করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, নূর খান, কিরানা ঘুরে আসছে। (৫) আমেরিকা, চীনের তোয়াক্কা না করে এস-৪০০ কিনছে। ভারতে অ্যাপেল-এর ফ্যাক্টরি হচ্ছে। (৬) ডলারকে গুরুত্বহীন করে ভারতীয় 'রুপে' ব্যবসা করছে। মুদ্রাস্ফীতি অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়নি। (৭) বিদেশি মুদ্রা ও সোনার রিজার্ভ রেকর্ড গড়েছে। (৮) বিলগ্নীকরণের ফলে সরকারি ব্যাংক, এলআইসি, বিএসএনএল পেয়েছে নতুন অভিমুখ। এগুলি বর্তমানে 'লাভজনক সংস্থা'য় পরিণত হয়েছে। এই আর্থিক সংস্থাগুলি এখন আর সরকারি ভরতুকির মুখাপেক্ষী নয়। (৯) ভারতে জি-২০ সামিট আয়োজন, জি-৭ গোষ্ঠীর সম্মেলনে ভারতের আমন্ত্রণ— বিশ্বে যেন সৃষ্টি করেছে এক 'ডাবল ইঞ্জিন'। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের অসংখ্য কূটনৈতিক সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশে ভারতীয় বসবাসকারীদের অবদানও প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। (১০) 'রুটি-কাপড়া-মকান', 'বেচে দিল সব', 'মালিয়া- নীরব-চোকসি' ইত্যাদি আওয়াজ যারা তোলেন বা গাল পাড়েন, দারিদ্র্যসীমা থেকে গরিব মানুষের উত্তরণ, জিডিপি বৃদ্ধি, ঋণখেলাপি পলাতকদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে তারা নীরব থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৭টি ইসলামি দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ওআইসি সম্মেলনে তুরস্ক, আজারবাইজান ছাড়া কোনো ইসলামি দেশ 'অপারেশন সিঁদুর'-এর নিন্দা প্রস্তাবে সায় দেয়নি।

দেশকে পরিচ্ছন্ন, নির্মল করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'। নোটবাতিলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে জালনোট। জিএসটি-র মাধ্যমে অনেকটাই বন্ধ হয়েছে কর ফাঁকি। বন্ধ হয়েছে কাঁচা বিল ও পাকা বিল। সরকারি কোষাগার হয়েছে পূর্ণ। বন্দেভারত থেকে ২১৩টি অসামরিক বিমানবন্দর, হাইওয়ে, চেনাব ব্রিজ, অটল টানেল থেকে মুম্বই ট্রান্স-হারবার লিংক— দেশজুড়ে চলছে পরিকাঠামো ও পরিবহণ উন্নয়ন।

ইউপিআই-এর মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে ডিজিটাল লেন-দেন। কালোটাকা, ঘুষ ইত্যাদি অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অর্থনীতি স্বচ্ছ, শক্ত হয়েছে। সরকারি রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প। প্রান্তিক চাষিরা কৃষক সম্মান নিধি পাচ্ছেন, গরিব-গৃহহীন মানুষ পাচ্ছেন আবাস, 'আয়ুষ্মান ভারত' বিমা যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন অগণিত ভারতবাসী। কোভিডের সময় ভয়ংকর আর্থিক মন্দা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যেও গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের কোণে কোণে পাঠানো হয়েছে খাদ্য। গরিব মানুষদের জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য পাঠানো হয়। বামপন্থী অর্থনীতিবিদরা সব নাগরিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার পরিণাম হতো ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি।

ভারতে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ৩০০ কোটি ভ্যাকসিন ডোজ বানিয়ে চমকে দিয়েছে 'আত্মনির্ভর ভারত'। দেশকে রক্ষা শুধু অস্ত্র নয় বিজ্ঞানও করে। বিশ্বে ৭১টি দেশকে, বিশেষ করে আফ্রিকার গরিব দেশগুলোকে ভ্যাকসিন পাঠিয়ে বাঁচিয়েছে ভারত। অগ্রগতির সোপানে আসীন এই ভারত শুধু বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি নয়, এ হলো 'বিশ্ববন্ধু ভারত'। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অনুসরণে অগ্রসর— শ্রেষ্ঠ ভারত, নতুন ভারত, বিকশিত ভারত। ■

জাপানকে টপকে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির তালিকায় চারে ঠাঁই করে নিল ভারত

আইএমএফের অনুমান, ভারত ২০২৮ সালের শেষে জার্মানিকে ছাড়িয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। ওই বছর ভারতের জিডিপি ছুঁতে পারে ৫৫৮৪.৪৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা জার্মানির ৫২৫১.৯২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে বেশি হবে।

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

পরিচালকের আসনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর নেতৃত্বেই দেশের উন্নয়নের পারদ চড়ছে তরতরিয়ে। মাত্র ১১ বছরের শাসনকালে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন দেশকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং কীভাবে তাঁর পূর্বসূরীদের অনেকের দূরদর্শিতার অভাবে দেশ ছিল পিছিয়ে। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে নিয়েছে দেশ। এর আগে ভারত ব্রিটেনকে টপকে যায়। এবার জাপানকে। ওই তালিকায় প্রথম স্থান দখল করতে ভারতকে আরও তিনটি দেশকে টপকে যেতে হবে। এই দেশগুলি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জার্মানি। বিশেষজ্ঞদের মতে দু'এক বছরের মধ্যেই জার্মানিকেও ছাড়িয়ে যাবে ভারত।

নরেন্দ্র মোদীর সময়কালে যে দেশের উত্থান হচ্ছে দ্রুতগতিতে তা বোঝা যায় পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখলেই। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেন মোদী। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের প্রধান তিনি। দেশের রাশ যখন তাঁর হাতে যায়, তখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির তালিকায় ভারত ছিল দশম স্থানে। মোদীর শাসনের অল্পকাল পরেই ভারতের ঠাঁই হয় তালিকার পঞ্চম স্থানে। দীর্ঘদিন যে জায়গাটা ধরে রেখেছিল ব্রিটেন। ব্রিটেনকে পিছনে ঠেলে পঞ্চম স্থানে চলে আসে ভারত। সম্প্রতি টপকাল জাপানকেও। অর্থাৎ বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির তালিকায় জাপানের স্থান হলো পাঁচে এবং ভারত অধিকার করল চতুর্থ স্থানটি।

জানা গিয়েছে, ভারতের মোট জিডিপি ছুঁয়ে ফেলেছে চার লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। ভারতের এহেন সাফল্যের কথা ঘোষণা করেছেন নীতি আয়োগের সিইও বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম। নীতি আয়োগের দশম গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকের পরেই সাংবাদিক বৈঠকে সুব্রহ্মণ্যম আইএমএফের তথ্য উল্লেখ করে বলেন, 'ভারত এখন চার লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতির দেশ। আজ ভারত জাপানের চেয়েও এগিয়ে।'

২০২৪ সালে ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি জাপানের চেয়ে ১১.৮ বিলিয়ন ডলারে পিছিয়ে ছিল। চলতি অর্থবর্ষে জাপানকে টপকে গেল ভারত।

ভারতের এই উন্নতির খবর ঘোষণার দিন সুব্রহ্মণ্যম বলেন, 'শুধুমাত্র আমেরিকা, চীন ও জার্মানিই আমাদের আগে রয়েছে। যা পরিকল্পনা হচ্ছে, আমরা যদি তা মেনে চলি, তবে আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে আমরা তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হব।' আইএমএফের অনুমান, এপ্রিলের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক রিপোর্ট অনুসারে ভারতের জিডিপি ২০২৬ সালে ৬.২ শতাংশ এবং ২০২৭ সালে ৬.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকেরও আশা, ২০২৬ সালে ভারতের অর্থনীতি ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি আশা রেখে সুব্রহ্মণ্যম বলেন, 'আপনারা অন্য দেশগুলির মতো এতটা ক্ষতিগ্রস্ত নন। ভারতের দক্ষ ও সস্তা শ্রমের সহজলভ্যতা দেশের পক্ষে সুবিধাজনক। দেশ এখন পরিচালিত হচ্ছে তরুণ কর্মীদের দ্বারা। যদি কেউ উল্লেখযোগ্যভাবে আগ্রহী হন, তাহলে ভারতই একমাত্র জায়গা যেখানে আপনি বৃহৎ পরিসরে সস্তায় শ্রমশক্তি পেতে পারেন। এটাই অনিবার্য ঘটনা।'

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বৃহত্তম অর্থনীতি আমেরিকার— ৩০ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। এর পরে রয়েছে চীন। তাদের অর্থনীতি ১৯.২৩ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের। তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হলো জার্মানি। তাদের অর্থনীতি ৪.৭৮ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের। চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারতের অর্থনীতি— ৪.১৯ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। পঞ্চম স্থানে রয়েছে ব্রিটেন। তাদের অর্থনীতি ৩.৮৪ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। তার পরেই রয়েছে ফ্রান্স। তাদের অর্থনীতি ৩.২১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার।

বিশ্বব্যাংক থেকে শুরু করে আইএমএফ এবং বেশ কয়েকটি

বিশ্বস্তরীয় সংস্থা ভারতীয় অর্থনীতির শক্তি স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতেও ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার অগ্রগণ্য থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে কেয়ারএজ রেটিং সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে আশা প্রকাশ করেছে, চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশ হবে। যার কারণে চলতি অর্থবর্ষের মোট বৃদ্ধির হার হবে ৬.৩ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কৃষি, হোটেল ও পরিবহণের পাশাপাশি উৎপাদন খাতে শক্তিশালী ভূমিকা ত্বরান্বিত করেছে ভারতের বৃদ্ধিকে।

ভারত যে জাপানকে টপকে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের তালিকায় চতুর্থ স্থানে চলে আসবে, তা আগেই জানিয়েছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার। তারা জানিয়েছিল, ২০২৫ সালেই ভারত জাপানকে ছাড়িয়ে পরিণত হবে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে। তাদের পূর্বাভাস, ২০২৭ বা ২০২৮ সালের মধ্যে জার্মানিকেও ছাপিয়ে গিয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে ভারত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টি এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির জেরেই তরতরিয়ে উঠছে ভারতের উন্নয়নের পারদ। তাই ভারত যে অচিরেই আমেরিকা ও চীনের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলবে তা বলাই বাহুল্য।

আইএমএফ ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্থিতিশীল আর্থিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের পূর্বাভাস দিয়েছে। ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যক্তিগত খরচ বৃদ্ধির দ্বারা আইএমএফ প্রকাশিত তথ্যটি সমর্থিত হয়। আইএমএফের মতে, ২০২৫ সালে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধি হবে ৬.২ শতাংশ এবং তার পরের বছর হবে ৬.৩ শতাংশ। আইএমএফ ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এবং পূর্বাভাস দেয়। এই পূর্বাভাসগুলি সাধারণত ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সূচকগুলির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। আইএমএফের পূর্বাভাস, ভারতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এবং দেশটি বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির তালিকায় নিজেদের স্থান আরও উন্নত করবে। ভারতে ব্যক্তিগত খরচ, সরকারি ব্যয়, বিনিয়োগ ও রপ্তানির মতো বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকগুলি অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, আইএমএফের পূর্বাভাসগুলি ভারতের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ পথ ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

কেবল আইএমএফ-ই নয়, বিশ্বব্যাংকও ভারতের অর্থনীতিকে দ্রুত বর্ধনশীল বলে মনে করে। তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ৬.৬ শতাংশ। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এটা হবে যথাক্রমে ৬.৭ ও ৬.৮ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে খুবই আশাবাদী। তারা বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের ভারতে লগ্নি করতে উৎসাহিত করে।

ভারত বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল দেশ। বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টস রিপোর্টে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনীতির তুলনায় বেশি। বিশ্বব্যাংকের মতে, ভারতের অর্থনীতিতে শক্তিশালী পরিষেবা ক্ষেত্র, ব্যক্তিগত খরচ এবং বিনিয়োগের স্থিতিশীলতা রয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেয় বিশ্বব্যাংক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মানবসম্পদে বিনিয়োগ—শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন—সবার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা, বিশেষত প্রান্তিক মানুষের। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা---পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নীতি গ্রহণ করা। সৃষ্টিকর্ম— কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করা।

প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাংক ভারতের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। তারা মনে করে, ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ সালে বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধির হারও হবে যথেষ্ট শ্লথ। আন্তর্জাতিক এই সংস্থার অনুমান, এই দু'বছর সারা বিশ্বের সূচক থাকবে ৩.৩ শতাংশ। আইএমএফের প্রধান অর্থনীতিবিদ পিয়েরে অলিভিয়ের গৌরিঞ্চাস বলেন, 'এ বছর বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পেয়ে নেমে আসবে ৪.২ শতাংশে। ২০২৬ সালে এটি আরও কমে দাঁড়াবে ৩.৫ শতাংশে।'

আইএমএফের অনুমান, ভারত ২০২৮ সালের শেষে জার্মানিকে ছাড়িয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। ওই বছর ভারতের জিডিপি ছুঁতে পারে ৫৫৮৪.৪৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা জার্মানির ৫২৫১.৯২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে বেশি হবে। আইএমএফের পূর্বাভাস, তার আগেই অর্থাৎ ২০২৭ সালেই ভারত হবে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনীতির দেশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দূরদৃষ্টি এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির জেরেই তরতরিয়ে উঠছে ভারতের উন্নয়নের পারদ। তাই ভারত যে অচিরেই আমেরিকা ও চীনের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলবে, তা বলাই বাহুল্য। ■

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হলো ভারত

ড. রামানুজ গোস্বামী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত আজ জাপানকে অতিক্রম করে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী সমস্ত ভারতবাসীর কাছেই আজ বাস্তবিকই এক অত্যন্ত গর্বের দিন। সম্প্রতি নীতি আয়োগের সিইও বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম এই সংবাদ জনসমক্ষে ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, ভারত আজ চার ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের এক সুবিশাল অর্থনীতি, যা দ্রুত গতিতে ছুটছে সামনের দিকে। ভারতের সামনে রয়েছে শুধুমাত্র আমেরিকা, চীন ও জার্মানি। এখানেই শেষ নয়; আইএমএফের নানা তথ্য উদ্ধৃত করে, সুব্রহ্মণ্যম আরও জানিয়েছেন যে, ভারত যেভাবে উন্নতি করছে এবং বিশ্ব অর্থনীতির নিরিখে ভারত এতটাই উন্নত ও সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছে যে, আগামী আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যেই ভারত জার্মানিকেও অতিক্রম করবে এবং হয়ে উঠবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি।

বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতির মোট পরিমাণ হলো ৪.১৮৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখানে একটা কথা অতি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তা হলো, ভারতীয় অর্থনীতি এই মুহূর্তে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতি। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে আগামী ২/৩ বছরেও ভারত বিশ্বে এই স্থান দখলে রাখতে সমর্থ হবে। বিশেষজ্ঞমহল আশা করছে যে, সেখানে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির হার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মাত্র ২.৭ শতাংশ, সেখানে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হার হতে চলেছে ৬.৭ শতাংশ। তাই একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং তার সঠিক রূপায়ণের কারণে ভারত আজ বিশ্ব অর্থনীতির এক

অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক দেশ। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতের লক্ষ্য আজ শুধুমাত্র জার্মানি নয়, তার লক্ষ্য ভারতীয় উপমহাদেশের আরেকটি দেশ অর্থাৎ চীন। একথা সত্য যে, চীনের অর্থনীতি মোট পরিমাণের দিক থেকে বিচার করলে, ভারতের বর্তমান অর্থনীতির তুলনায় বেশ কয়েকগুণ বড়ো। কিন্তু লক্ষণীয় যে, চীনের অর্থনীতির বৃদ্ধির হার ভারতের তুলনায় অনেক কম।

আগামী অর্থবর্ষে চীনের অর্থনীতির বৃদ্ধির হার হতে চলেছে মাত্র ৪ শতাংশ যা ভারতের থেকে অনেকটাই কম। আমেরিকার অবস্থা তো আগামীদিনে যথেষ্টই খারাপ হতে চলেছে। আমেরিকার ক্ষেত্রে এটা বলাই যেতে পারে যে, এই দেশটি এতদিন উচ্চতম শিখরে আরোহণ ও অবস্থান করলেও, ধীরে ধীরে তার অবনমনের পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। নানা আভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত আমেরিকা আজ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, ঋণের ভার, দেশের মধ্যে চাহিদার ঘাটতিজনিত মন্দার আভাস, বৈদেশিক বাণিজ্য শুল্কের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে যথেষ্টই টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতে আমেরিকা সবরকম প্রচেষ্টাই করে চলেছে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারত-পাকিস্তান সমস্যার দ্রুত ও চিরস্থায়ী সমাধানে আমেরিকা মোটেই আগ্রহী নয়। কারণ এই সমস্যাকে জিইয়ে রাখলে ভারতকে মাঝে মাঝেই বিব্রত হতে হবে, যার প্রভাব পড়বার সম্ভাবনা থাকে ভারতীয় অর্থনীতিতে। পাশাপাশি, শত্রুর শত্রু হলো মিত্র, এই ধারণাকে বজায় রেখে চলেছে চীন আর তাই চীন সব রকম ভাবেই পাকিস্তানকে সহায়তা করে চলেছে। বাংলাদেশও ঠিক এই কারণেই চীনের মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে। কিন্তু এতসব শত্রু দ্বারা নানাভাবে আক্রান্ত হয়েও ভারত তার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, কারণ এটাই নতুন ভারত, সশক্ত ভারত। ভারতীয় অর্থনীতি এত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী কেন বা কীভাবে হলো, এবারে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েক বছর আগে ভয়াবহ অতিমারী যা সারা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করেছিল, তা ভারতেও থাবা বসিয়েছিল। কিন্তু এক উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারত যেভাবে তার মোকাবিলা করেছিল, তা উন্নত বিশ্বকেও যারপরনাই বিস্মিত করেছিল। ভারত তৈরি করেছিল 'কোভ্যাক্সিন' যা একেবারেই দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি। এই ভ্যাক্সিন শুধুমাত্র যে দেশবাসীকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল, তা নয়, দেশের মানুষের চাহিদা মিটিয়ে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও বিতরণ করা হয়। বর্তমানকালে 'ব্রহ্মোস' ক্ষেপণাস্ত্রের কথা তো আমরা সবাই জানি, একেবারেই দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এক ভয়ংকর সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র। ইতোমধ্যেই পৃথিবীর শতাধিক দেশ ভারতের কাছে এই ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয় করতে চেয়েছে এবং চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। এগুলো বলবার কারণ এটাই যে,ভারত আজ সর্ববিষয়েই স্বনির্ভর এবং আমদানির পরিবর্তে দেশ আজ রপ্তানির দিকে বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছে। ২০১৪ সালে ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে ১১তম স্থানে ছিল আর আজ ২০২৫ সালে ভারতের স্থান চতুর্থ।

পাশাপাশি বলা দরকার যে, এই সময়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি হয়েছে এবং মাথা পিছু আয়ও বেড়েছে দ্বিগুণ। বর্তমানে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় প্রায় ২৯০০ মার্কিন ডলার। এটা বোঝা দরকার যে, ভারতের জনসংখ্যা ১৫০ কোটিরও বেশি। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ যাদের জনসংখ্যা হয়তো-বা ভারতের একটা রাজ্যের সমান বা তার থেকেও কম, তাদের সঙ্গে ভারতের তুলনা করা একেবারেই অবান্তর। ভারত যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই ১০৫ শতাংশ উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছে, তার জন্য প্রধান কারণগুলি হলো—

১। জিএসটি সংস্কার ও সরলীকৃত কর ব্যবস্থা।

২। আত্মনির্ভর ভারত ও মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্প।

৩। দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া।

৪। মোদীজীর নেতৃত্বে দেশীয় পণ্যসামগ্রী ব্যবহারে দেশের জনসাধারণকে উৎসাহিত করা অর্থাৎ ভোকাল ফর লোকাল প্রকল্প।

৫। উৎপাদনের ক্ষেত্রে নানাভাবে উৎপাদকদের উৎসাহভাতা তথা ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা করা।

৬। ক্রমাগত উন্নয়নশীল পরিষেবা ক্ষেত্র ভারতকে দ্রুত অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে।

৭। অসাধারণ সুদৃঢ় শিল্পক্ষেত্র গড়ে উঠেছে এবং সড়ক, রেল, বিদ্যুৎ, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সবরকম পরিকাঠামোর উন্নয়নে ভারত সরকারের বিপুল বিনিয়োগের কারণে আজ দেশ-বিদেশের অগণিত শিল্পপতি ভারতে বিনিয়োগ করতে ও ব্যবসা করতে আগ্রহী। ফলে কর্মসংস্থানে জোয়ার এসেছে। দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের সময়কালে দেশে সৃষ্টি হয়েছে এক উন্নত ও সুনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিবেশ, যা অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রের মানোন্নয়নে খুবই সহায়ক হয়েছে।

বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্য দেশের এই অগ্রগতিতে মোটেও খুশি নয়। এটাই স্বাভাবিক, কারণ এদের কাছে দেশ নয়, প্রাধান্য পায় দল, পরিবার ও ব্যক্তিস্বার্থ। কিন্তু এরা ভুলে গিয়েছে যে, এই কেন্দ্রীয় সরকার সকলের সঙ্গে থেকে, সকলের বিশ্বাস অর্জন করতে জানে আর তাই গড়ে উঠছে বিকশিত ভারত। ভারত আজ বিশ্বগুরু এবং মাত্র কয়েক দশক পরেই এই বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতির নাম হতে চলেছে ভারত। ■

ফঃ ৪

তাঁতিবেড়িয়ায় দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ১ জুন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে। গত ১৭ মে থেকে শুরু হওয়া ১৫ দিনের এই বর্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাংগঠনিক জেলাগুলি থেকে ১৫২ জন — ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা স্বয়ংসেবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্গাধিকারী ও বর্গ কার্যবাহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে রমেশ বেরিওয়াল এবং ইন্দ্রনাথ রায়। বর্গে মুখ্য শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ সঞ্জয় দত্ত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ গোপালচন্দ্র মিশ্র। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল দীপনারায়ণ বাগচী (অবসরপ্রাপ্ত)। প্রধান বক্তারূপে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সহ প্রচারক জলধর মাহাত। এছাড়াও মঞ্চাসীন ছিলেন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবকরা সঞ্চলন, ব্যায়ামযোগ, যোগাসন, দণ্ড, নিযুদ্ধ ও ঘোষ (বাদ্যযন্ত্র)-এর বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শ করেন। এরপরেই বর্গকার্যবাহ ইন্দ্রনাথ রায় বর্গের প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি তাঁদের ভাষণে রাষ্ট্রগঠনে সঙ্ঘের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রধান বক্তা তাঁর ভাষণে সঙ্ঘের শতবর্ষের যাত্রায় সঙ্ঘের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করে উপস্থিত নাগরিকদের সঙ্ঘকার্যে সহযোগী হবার আবেদন রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বর্গের বৌদ্ধিক শিক্ষণ প্রমুখ তথা কলকাতা মহানগরের দক্ষিণ বিভাগ প্রচারক রবিকিঙ্কর ঘোষ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বর্গের সর্বব্যবস্থা প্রমুখ তথা হাওড়া মহানগর প্রচারক অর্জুন মণ্ডল।

অসম ক্ষেত্রের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ প্রথম (সাধারণ)-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ প্রথম (সাধারণ)-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গত ১ জুন ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার চাম্পামুড়াস্থিত সেবাধাম পরিসরে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোরা নিবাসী বিশিষ্ট কৃষক মৃণাল দেব। প্রধান

বক্তারূপে ছিলেন ত্রিপুরা প্রান্ত প্রচারক নিখিল নিবাসকর। গত ১৩ মে থেকে শুরু হওয়া এই কার্যকর্তা বিকাশ বর্গে ছাত্র, কৃষক, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার ১০২ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বর্গে সর্বাধিকারী হিসেবে প্রফুল্ল বড়ো এবং বর্গ কার্যবাহ হিসেবে কনকলাল দাস দায়িত্ব পালন করেন।

বর্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, 'মাতৃহস্তে ভোজন'। একদিন সমাজের বিভিন্ন পরিবারের মায়েরা উপস্থিত থেকে তাঁদের স্বহস্তে তৈরি খাদ্যসামগ্রী বর্গের শিক্ষার্থী কার্যকর্তাদের পরিবেশন করেন। সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে সাতদিন এই বর্গে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থী কার্যকর্তাদের পথনির্দেশ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কার্যকর্তারা সামরিক কায়দায় সঞ্চলন করে গৈরিকধ্বজ প্রদক্ষিণ করেন। তারপর ব্যায়ামযোগ, যোগাসন, নিযুদ্ধ, দণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন এবং একক গীত ও অমৃতবচন পরিবেশন করেন। তারপরে বর্গ কার্যবাহ বর্গের প্রতিবেদন পাঠ করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে শিক্ষার্থী কার্যকর্তাদের স্বয়ম্ভরতার বার্তা দেন। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত হয়েও কীভাবে চাষের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার উল্লেখ করেন। প্রধান বক্তা নিখিলজী সঙ্ঘের শতবর্ষে স্বয়ংসেবকদের করণীয় কাজের বিষয়ে উল্লেখ করে সমাজের সবাইকে সহযোগী হবার আবেদন রাখেন।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

হালিসহরে দক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃতভারতীর পূর্বক্ষেত্রীয় সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ৩ জুন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিসহরে অসম-বঙ্গীয়-স্বামী নিগমানন্দ-সারস্বত মঠে সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে সংস্কৃত শিক্ষকদের জন্য ১২ দিনের আবাসিক 'পূর্বক্ষেত্রীয় প্রশিক্ষণ বর্গ'-এর আয়োজন করা হয়। বর্গে ৬৫ জন সংস্কৃত শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বর্গের শুভারম্ভ করেন নিগমানন্দ মঠের সন্ন্যাসী প্রণবচৈতন্য মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক বিজয় আঢ্য, সংস্কৃতভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তাধ্যক্ষ সিদ্ধিনাথ পাঠক। শ্রীআঢ্য তাঁর ভাষণে বলেন, সংস্কৃতভারতী সংস্কৃত ভাষা প্রচারের মাধ্যমে দেশের সেবা করে চলেছে। দেশকে শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় পৌঁছে দিতে সংস্কৃত শিক্ষা এবং সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারকে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। শ্রীপাঠক তাঁর ভাষণে বলেন, এই আশ্রমিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত শিক্ষার সহজ-সরল কৌশলগুলি আয়ত্ত করবেন যা তাঁদের আগামীদিনের পাথেয় হবে এবং সংস্কৃতভাষার প্রচার-প্রসারে অত্যন্ত লাভদায়ক হবে।

নেতাজী পরিবারের সদস্য ও নেতাজী গবেষকদের সাংবাদিক সম্মেলন

গত ২৯ মে বিচারক ও ভারতে ইউনেস্কোর অফিসিয়াল পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ আর্টের গুডউইল অ্যাম্বাসাডার বিপ্লব রায়ের উদ্যোগে কলকাতা প্রেসক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। বিপ্লব রায়ের সঙ্গে এই সাংবাদিক সম্মেলনটির আয়োজক ছিলেন নেতাজী গবেষক সৈকত নিয়োগী এবং ইতিহাসধর্মী লেখক সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত। সম্মেলনে বক্তারূপে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁর মহানিষ্ক্রমণে অন্যতম প্রধান সহযোদ্ধা অশোকনাথ বসুর উত্তরসূরী জয়ন্তী রক্ষিত (বসু), তপতী ঘোষ (বসু) ও আর্যকুমার বসু। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিপ্লব রায়, সৈকত নিয়োগী ও সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুতত্ত্বের বিপক্ষে সকলেই বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত জানান, ১৯৫৬ সালে তাইওয়ান সরকার তাদের একটি তদন্ত রিপোর্টে জানিয়ে দেয় যে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে কোনো বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি। নেতাজীর মৃত্যুর সাক্ষী হিসেবে শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনে যাঁদের নাম উঠে এসেছিল, তাঁরা নেতাজীর মৃত্যু, এমনকী বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে কোনো প্রমাণই দিতে পারেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালে তাইওয়ান সরকার এই রিপোর্ট ভারত সরকারকে পাঠালেও এই রিপোর্টের বিষয়টি অস্বীকার করে তদানীন্তন ভারত সরকার। ১৯৯৯ সালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যের সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠন করে একটি তদন্ত কমিশন। এই কমিশন ব্রিটেনের ন্যাশনাল আর্কাইভ থেকে এই রিপোর্টটি ভারতে নিয়ে আসে। এই রিপোর্টটির বিষয়ে কমিশনে বক্তব্য রাখেন চিকিৎসক, নেতাজী গবেষক ও কমিশনের অন্যতম ডেপোনেন্ট ডাঃ মধুসূদন পাল। ডাঃ পাল ও বিশিষ্ট আইনজীবী কেশব ভট্টাচার্যের লেখা বইতেও এই রিপোর্টটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজক এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মেজ দাদা শরৎচন্দ্র বসুর পৌত্র-পৌত্রীরা তাইওয়ান সরকারের এই রিপোর্টটি এদিন পুনরায় প্রকাশ্যে আনেন। সম্প্রতি লন্ডনের ন্যাশনাল আর্কাইভ থেকে তাইওয়ান সরকারের রিপোর্টটি সংগ্রহ করেন সৈকত নিয়োগী। সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিক, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সদস্য ও বিশিষ্টজনদের হাতে এই রিপোর্টের প্রতিলিপি তুলে দেন সৈকত নিয়োগী ও সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত। জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্টের পক্ষে ইন্দ্রাশিস ভট্টাচার্য 'ঐ মহামানব আসে' পুস্তকটি সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের হাতে তুলে দেন। নেতাজী পরিবারের সদস্যরা জোরালোভাবে জানান, তাইহোকুতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ হলো এই 'তাইওয়ান রিপোর্ট'। ১৯৪৫ পরবর্তী পর্যায়ে বর্মা, ভিয়েতনাম, চীন, রাশিয়া ও ভারতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যা বারবার নানা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু স্বীকৃতি দেয়নি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার। তাঁরা বলেন, তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর দাবিতে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের সিলমোহর যদি তাঁর অন্তর্ধান রহস্য ধামাচাপা দেওয়ার প্রথম ষড়যন্ত্র হয়, তাহলে 'ভুয়া' চিতাভস্ম আনার সাম্প্রতিক উদ্যোগ সেই পর্বের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র। বিপ্লব রায় বলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন নেতাজী শুধু তাঁর পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ নন। দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষের হৃদয়ে তিনি এখনও রয়েছেন। এর আগে দুটি কমিশন হয়েছিল। তারপর গঠিত বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশন। সেই কমিশন তাদের রিপোর্টে সব বলে দিয়েছে। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি। তাঁর অভিযোগ, এটা একটা বিরাট চক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে দেশবাসীর রুখে দাঁড়ানো প্রয়োজন।

ঋষি উদ্ভাবিত এক অভিনব পন্থা
যোগবিজ্ঞান

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

যোগ বা যোগা। আরও কায়দার পশ্চিমি উচ্চারণে ইয়োগা; ইদানীং দেশে-বিদেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে এক অদ্ভুত উন্মাদনায় মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে! সমাজের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই তা দেশেই হোক বা বিদেশেই হোক, কিছু নিয়মমাফিক শরীরচর্চা বা ব্যায়ামকেই যোগ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

যোগাসন আর প্রকৃত যোগ কখনোই এক জিনিস নয়। বিশেষ কিছু আসনের সঙ্গে কিছু শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও নিঃসরণের কায়দা যে প্রকৃত যোগবিদ্যা নয়, তা আর কেউ না বুঝুন সত্যিকার যোগ অনিসন্ধিৎসু যাঁরা, তাঁরা কিন্তু ঠিকই বোঝেন! যদিও, এই হটযোগ বা যোগাসন করলে তার সুফল কিন্তু উপলব্ধি করা যাবেই। সনাতন ভারতে হটযোগের স্থান যোগী সমাজে সর্বনিম্নে হলেও প্রকৃত গুরু সান্নিধ্য এই যোগেরও মূল। ভারতবর্ষে সবরকম যোগ পদ্ধতিই তাই পুরোপুরি গুরুমুখী। মানসিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরণের পন্থা। তা যে, লয়যোগ, রাজযোগ, সিদ্ধযোগ, শিবযোগ, বিহঙ্গযোগ, ক্রিয়াযোগ, উদগীথযোগ যাই হোক না কেন! সবই শেষপর্যন্ত ব্রহ্মস্থিতি লাভের বৈজ্ঞানিক পথ।

সনাতন ঋষিরা যোগকে এককথায় বলেছেন 'জীবাত্মা পরমাত্মনোটরকম', অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য বা মিলন! যতক্ষণ না এই মিলন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বা গুরু প্রদর্শিত পথে সাধিত হচ্ছে ততক্ষণ যোগসিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। যোগ বিজ্ঞানের প্রথম ধাপই হলো চঞ্চল চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরোধ করা। তাই যোগবিজ্ঞান হলো এমন এক মিলন বিজ্ঞান যার প্রথম ভাগেই আছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ প্রক্রিয়া।

আমাদের মন অর্থাৎ চিত্ত সারাক্ষণই চঞ্চল। সারাক্ষণই সে বিক্ষিপ্ত। সহস্র সহস্র বাসনা-কামনার জালে আমরা আটকে রয়েছি সর্বদাই। একটি মুহূর্তও আমরা কামনা-বাসনা ও লালসার লালা বিজড়িত জাল থেকে মুক্ত নই। এর ফলেই আমাদের চিত্ত চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত। এসব উপলব্ধি করেই ঋষিরা বলেছিলেন, প্রথমেই এই যে বাসনা নামক রোগের চিকিৎসা শুরু করো! যার একমাত্র উপায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ। জড় গবেষণাগারের পরিধির শেষে, নিজের শরীরকে যদি গবেষণাগার বানানো যায়, তবেই একাজ সম্ভব। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা যাঁদের বলা যায় এক কথায় যোগবিজ্ঞানী, তাঁরা বহু অধ্যবসায়, পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। এই ভুয়োদর্শনের ফলশ্রুতিই হলো বিশেষ জ্ঞান আর যোগ। তাই বিজ্ঞান যা শুরু হচ্ছে জড়বিজ্ঞানের সীমানর শেষে।

সনাতন ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে পুনর্জন্মতত্ত্বে। জীব বারবার জন্মগ্রহণ করে এই কামনা-বাসনা চিত্তে সংস্কার রূপে সঞ্চিত থাকার ফলে। ঋষিরা বলেছেন— জন্ম হলে মরণ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার যে 'দ্বিতীয় অধ্যায়' সেই 'সাংখ্যযোগ'-এ ভগবান নিজ শ্রীমুখে বলেছেন— 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।' (গীতা ২।২৭) তাই, জন্মালে মরণ, মরলে আবার

পুনর্জন্ম। বার বার জন্ম-মৃত্যু মানে বার বার সেই একইভাবে রোগ, শোক, জরা, কামনা, সন্তাপ, অশান্তি ভোগ করা! জীব চায় চিরকার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, শান্তি, সুখ ভোগ করতে। এ তার অনাদি চাওয়া। দুঃখহীন জীবন পেতে গেলে জন্মান্তরের পারে গিয়ে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ অনিবার্য। সেই জন্যই চিত্তবৃত্তি নিরোধের আবশ্যকতা। যা একমাত্র উপলব্ধ হয় কামনা- বাসনার ক্ষয় হলে। আর বাসনা না থাকলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। গীতার 'পঞ্চমঅধ্যায়' অর্থাৎ 'কর্মসন্ন্যাস যোগের' ২১নং শ্লোকে বলা হচ্ছে—

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।।

— অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত ও ব্রহ্মভাবে সমাহিত ব্যক্তি আত্মাতে আনন্দলাভ করেন। এই অবস্থায় তিনি অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করেন।

এই কারণেই জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন বিজ্ঞানম বা ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি লাভের পন্থা উদ্ভাবন করা সনাতন বৈদিক ঋষিদের খুবই ভাবিত করেছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন, জীব স্বল্পায়ু। এক জীবনে যদি ব্রহ্মস্থিতি লাভ করতে হয়, তো যেভাবেই হোক আয়ুর বিস্তৃতি প্রয়োজন। তা না হলে চিত্তবৃত্তি রোধ করার মতো সময় একটি মাত্র জীবনেই মানুষ পাবে না। আর একজীবনে তা না পাওয়ার অর্থ পুনর্জন্ম। বার বার পুনর্জন্ম রোধের চিন্তা আর চির সুখসাগরে অবগাহনের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে তাঁরা আবিষ্কার করলেন 'খ্যাদ্যবিজ্ঞানের নিয়ম। যে নিয়ম যোগ সাধনার বিশেষ সহায়ক। তাঁরা দেখেছিলেন চিত্তবৃত্তিকে রোধ করতে গেলে আহার সংযম বিশেষভাবে জরুরি।

আমরা প্রশ্বাস গ্রহণ কালে বাতাসের অক্সিজেন বা অম্লজান গ্রহণ করি। এই অক্সিজেন বা অম্লজান জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের খাদ্য হজমে, রক্তশোধনে, শরীরে উত্তাপ তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। এই জারণক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত জীবনীশক্তির এক ক্ষুদ্রাংশ সঞ্চালিত হয় আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলির পুষ্টি ও তাদের মধ্যে পারমাণবিক কম্পন বা cellular vibration ঘটতে এবং যার থেকে উন্মেষ ঘটে 'চিত্তবৃত্তি'র। আবার এই জারণের ফলেই দেহে উৎপন্ন হয় দ্ব্যম্লাঙ্গার বা অঙ্গারিকাম্ল অর্থাৎ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের। যা নিঃশ্বাস রূপে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এইসব ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলেই হয় ক্ষুধার উদ্রেক এবং একই সঙ্গে প্রারম্ভ ঘটে ক্ষয়ের। সোজাকথায়, এই নিঃশ্বাস- প্রশ্বাসই মানুষের চিত্তবৃত্তি ও আয়ুনাশের কারণ।

যোগবিজ্ঞানী ঋষিরা এই শ্বাস-প্রশ্বাস নামক ক্রিয়াটিকে নিরুদ্ধ করেই প্রাপ্ত হন চিত্তবৃত্তি নিরোধক অবস্থা বা যোগাবস্থা। যোগাবস্থায় কোনোরকম ক্ষয়ক্রিয়া হয় না বলেই, পক্ষান্তরে আয়ুরও বৃদ্ধি ঘটে। যোগবিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতিতে এই শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই হলো প্রাণায়াম। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম। প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি— এ সবই হলো অষ্টাঙ্গ যোগের বিভিন্ন অবস্থার ভেদ বা সহায়ক। প্রাণায়ামের পরিণামে যোগবিজ্ঞানী প্রাপ্ত হন সমাধি। সমাধি অর্থ সমভাবে অধিষ্ঠান করা। এই অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ ও ক্ষয় শূন্যতা একই সঙ্গে চলতে থাকায় ঘটতে থাকে আয়ু বৃদ্ধি।

ঋষিরা অনুভব করেছিলেন খাদ্য হজম করতে যতটুকু অক্সিজেন প্রয়োজন, ঠিক যদি ততটুকুই গ্রহণ করা যায়, তবে দেহের ক্ষয় ও চিত্তবৃত্তি নিরোধ খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়। শুধু তাই নয়, এর ফলে রেহাই পাওয়া যাবে জরা-ব্যাধির হাত থেকেও।

বেদজ্ঞানী ঋষিরা তাঁদের জীবনের সব কিছুই গ্রহণ করতেন প্রকৃতি মায়ের কাছ থেকে। তাঁদের তপোবন, সাধনা, জীবনধারণ সবকিছুতেই ছিল প্রকৃতির সান্নিধ্য। সুতরাং প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যেই তাঁরা শুরু করেছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ সত্যানুসন্ধান। শুরু হলো সেইসব প্রাণীদের খোঁজ যারা স্বভাব-সমাধিবান। তাঁরা দেখলেন এবং সাহায্য নিলেন প্রকৃতির সব বস্তু ও প্রাণীর। যেমন স্বভাব-সমাধিবান প্রাণী হিসেবে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করলেন, সাপ, ব্যাঙ, কচ্ছপ প্রভৃতিকে। এরা শীতঘুম দেয় নাতিশীতোষ্ণ পরিমণ্ডলে এবং সেই সময় তারা জিভকে উলটো করে তালুগহ্বরে ঢুকিয়ে দেয়। এসময় কোনোরকম জৈবিক ক্রিয়া তাদের থাকে না। সম্পূর্ণ বৃত্তি নিরোধক উপায়ে তারা দীর্ঘজীবন লাভ করে, যেমন— কচ্ছপ। তাঁরা গোমুখাসন, পদ্মভঙ্গিমায় পদ্মাসন, শবাসন, সিদ্ধাসন, হংসের ভঙ্গিমায় হংসাসন; বিড়ালের থেকে মার্জারাসন, উটের থেকে উষ্ট্রাসন, মাছের থেকে মৎস্যাসন,ঈগলের ভঙ্গিমা থেকে গরুড়াসন, কচ্ছপ থেকে কূর্মাসন আবিষ্কার করলেন। উদ্ভাসিত হলো খেচরীমুদ্রা।

খেচরী মুদ্রা অনুশীলনে তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন জিহ্বাকে যদি উলটো করে তালুদেশে প্রবেশ করানো যায়, তাহলে তালুনিঃসৃত একরকম রসের প্রভাবে, ক্ষুধা, ক্ষয়, রোগ-ব্যাধি, জরা— সবই জয় করা যায়। উপরন্তু চিত্তবৃত্তি নিরোধ হেতু দেহ-মন আনন্দে ভরে যায়! শুধু তাই নয়, আয়ুবৃদ্ধি হেতু বহুদিন সুস্থভাবে বাঁচার উপায় থাকবে। ভারতের আধ্যাত্ম ইতিহাসে বহুবর্ষজীবী যোগীরা এই পন্থাই অবলম্বন করেন। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। যেমন : 'তৈলঙ্গ স্বামী (২৮০ বছর)', 'ভাস্করানন্দজী', 'লোকনাথবাবা' (১৬০ বছর), 'দাদাজী বরফানী বাবা' (প্রায় ৩০০ বছর), কাশীর

কামরূপ মঠের' অচ্যুতানন্দজী' (১০৭ বছর) আর কাশীর শিবানন্দজী তো এই সেদিন ১২৯ বছর বয়সে দেহ রাখলেন!

এদেশের গিরিকন্দরে আজও বহু যোগী সাধক রয়েছেন যাঁরা দীর্ঘজীবন লাভ করে রত আছেন মানব কল্যাণে। এর পিছনে যোগবিজ্ঞানের ভূমিকা কী? তাই যদি প্রশ্ন হয় তবে বলি, ঋষিদের অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ২৪ ঘণ্টায় ২১৬০০ বার প্রশ্বাস গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এটা ধ্রুব সত্য। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা বা হার যোগবিজ্ঞানের প্রকরণগুলির সাহায্যে প্রশমন বা হ্রাস করেই যোগীরা লাভ করেন দীর্ঘজীবন। ঋষিবাক্য অনুসারে জীব একটি নির্দিষ্ট শ্বাসসংখ্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যতদিন না এই শ্বাসসংখ্যা তার পূর্ণ হচ্ছে, স্বয়ং কালও তাকে ছুঁতে পারে না।

যোগবিজ্ঞানী ঋষিরা প্রমাণ করেছেন যা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও সমর্থিত, তাহলো প্রাণীদের মধ্যে কচ্ছপই সবচেয়ে বেশিদিন বাঁচে। ঋষিদের নিরলস পর্যবেক্ষণে তাঁরা দেখেছিলেন, মানুষ মিনিটে প্রায় ১৫ বার, কুকুর প্রায় ২৮ বার, বানর ৩৪ বার, বিড়াল ২৪ বার, ঘোড়া ১৬ বার ও কচ্ছপ মাত্র ৩ বার শ্বাস গ্রহণ করে। এটাই তাদের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাসগ্রহণ। যেহেতু, কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ সমানুপাতিক, তাই যত কম শ্বাসগ্রহণ তত বেশি আয়ু। সেজন্যই কচ্ছপের শারীরিক ক্ষয় কম ও দীর্ঘজীবী।

অতএব, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা যত কমবে-তত কমে যাবে শারীরিক ক্ষয়। আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের হার যত কম হবে, তত কমে যাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য। নাসাগ্র থেকে নিঃশ্বাসের স্পর্শ যতদূর অনুভব করা যায়, তাই হলো শ্বাস-প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য। এই দৈর্ঘ্য কমার সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের মাত্রা ও অক্সিজেন গ্রহণ। ধীরে ধীরে যোগী প্রাপ্ত হবেন চিত্তবৃত্তি নিরোধক অবস্থা। আর, সেই অক্ষণবেধী উপায়কে তরান্বিত করতে যোগীরা একাগ্রতা, নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত, ত্রাটক, কুম্ভক, রেচক, পুরক প্রভৃতির আশ্রয় নেন। তাঁরা চান যে কোনো উত্তেজনা থেকে দূরে থাকতে। অধিকাংশ যোগী লোকসমাজ থেকে দূরে শান্তিপূর্ণ নাতিশীতোষ্ণ পরিমণ্ডল বেছে নেন। কারণ, তারা জানেন বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে এ শ্বাস-প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

স্বরোদয় যোগ শাস্ত্র প্রাচীন ভারতীয় একটি তন্ত্রশাস্ত্র। যা শ্বাসপ্রশ্বাস এবং শরীরের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। সেই স্বরোদয় শাস্ত্রে শিব-পার্বতীর কথোপকথনের ছলে ঋষিরা বলে গেছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের প্রাণের বা শ্বাস-প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য ১২ আঙুল। প্রতিটি আঙুলের প্রস্থ হিসেবে য়া মোটামুটি ০.৭৮ ইঞ্চি। সুতরাং ১২ আঙুল মানে মোটামুটি ৯.৩৬ ইঞ্চি। যা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে। হাজার হাজার বছর আগেই এদেশের যোগবিজ্ঞানীরা বলে গেছেন স্বাভাবিক অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থা বা কার্যকলাপের সময় এই দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন, খাবার সময়, দৌড়াবার সময়, মৈথুনকালে, নিদ্রার সময়; এক-এক অবস্থায় হবে এক-এক রকম। অর্থাৎ প্রতিটি কর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে এই স্বাভাবিক সাম্যাবস্থার হেরফের ঘটে।

প্রাচীন যোগবিজ্ঞানী ঋষিদের দ্বারা এটাও পরীক্ষিত হয়েছে যে, এই শ্বাস-প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য কমার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের 'বিভূতি' স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জন করা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য ৮.২৫ ইঞ্চিতে নামলে যোগী হন জিতেন্দ্রিয়। ৭.৫ ইঞ্চিতে আনন্দলাভ, ৩.৭৫ ইঞ্চিতে লেখনী শক্তি, ৬ ইঞ্চিতে নামলে জানা যায় ভবিষ্যৎ, ৫.২৫ ইঞ্চিতে সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ হয়, ৪.২৫ ইঞ্চিতে মাধ্যাকর্ষণকে জয় করা যায়, ৩.৭৫ ইঞ্চিতে দূরের জিনিস বা স্থানে ঘটা বিষয় দর্শিত হয়, ৩ ইঞ্চিতে অনিমাদি শক্তি লাভ, ১.৫ ইঞ্চিতে সূক্ষ্ম শরীরে যায় বিচরণ করা, ০.৭৫ ইঞ্চিতে হয় ব্রহ্মানুভূতি আর এই শ্বাস-প্রশ্বাস যখন একেবারেই বাইরে আসে না, ভিতর ভিতর চলতে থাকে, তখনই হয় নির্বাণ লাভ।

যোগীরা লক্ষ্য করেছেন, কোনো মানুষ যদি একই সময়ে প্রতিদিন একই নিয়মে এই অভ্যাস চালিয়ে যায় তাহলে কিছু বছর পর ঠিক ওই সময়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে যাবে। এমনকী কিছু বছর পর ঠিক ওই সময় যদি সে সাধনায় বসার সময় নাও পায়, তাহলেও অন্তত কিছুদিন এই সময় তার শ্বাসসংখ্যার হেরফের হবে না। যে কারণে নিষ্ঠাবান লোকেদেরও নির্দিষ্টক্ষণে সন্ধ্যা করার নিয়ম প্রচলিত। ব্রাহ্মমুহূর্তে বা উষাকালে, সন্ধ্যায় এবং গভীর রাত— এই সময়গুলিই সাধনার সময়, কারণ তখন প্রকৃতি থাকে শান্ত ও শীতল।

ঋষিরা তাই বলেছেন দিনের নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট জায়গা বা আসনে বসে সাধনা করতে হয়। যোগবিজ্ঞানের পন্থাগুলি ঋষিদের এমনই এক অভিনব উদ্ভাবন যার মধ্যে লুক্কায়িত আছে মানব জীবনের ধ্রুব ও অনাদি সত্যগুলি। তাই সামগ্রিকভাবে যোগবিজ্ঞান এক পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানভিত্তিক পথ যা মানবকে দেবত্বে উন্নীত করে, এনে দেয় নির্বাণরূপ মোক্ষ এবং অবশেষে শিবত্ব। □

সুস্থ শরীর-মনের জন্য যোগাভ্যাস জরুরি

প্রদীপ মারিক

যোগব্যায়াম ও ধ্যান জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রীমদ্ভগবত গীতায় যে আঠারোটি অধ্যায় আছে প্রথমটি অর্জুন বিষাদযোগ এবং শেষটি মোক্ষ সন্ন্যাসযোগ। সবকটি অধ্যায় যোগের ওপর দাঁড়িয়ে। বর্তমান দিনে মানসিক শান্তি পাওয়া খুব কঠিন। এই মন ও শরীরের জন্য প্রয়োজন যোগাসন। বর্তমান দিনে মনের এই অশান্তি কীভাবে দূর করা যায় তার পথ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর-মন ভালো হয়। একটা শান্তির সকাল এসে পড়ে। যোগবিশেষজ্ঞরা বিভিন্নভাবে যোগের উপযোগিতার কথা বলেছেন। তারা বোঝাতে চেয়েছেন যোগ কেন দরকার? চিকিৎসকরাও রোগ নিরাময়ে যোগের কথা বলেন।

যোগ একটি প্রাচীন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন যা ভারতে উদ্ভূত হয়েছে। 'যোগ' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে। এর অর্থ মিলন, সংযোগ বা একত্রিত হওয়া। আন্তর্জাতিক যোগদিবস লোগোতে দুই হাত ভাঁজ করা যোজনকে প্রতীকীকরণ করে। যা সর্বজনীন চেতনা, মন শরীর এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিখুঁত সাদৃশ্যর সঙ্গে স্বতন্ত্র সচেতনতার মিলনকে প্রতিফলিত করে। এতে বাদামিপাতা পৃথিবীর উপাদান। সবুজপাতা প্রকৃতির প্রতীক। নীল রং উজ্জ্বলতার প্রতীক। লোগোটি মানবতার জন্য সম্প্রীতি ও শান্তি নির্দেশিত করে, যা যোগের সারমর্ম।

প্রাণায়াম মূলত শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ। প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রাণের দীর্ঘতাই প্রাণায়াম। সঠিক নিয়মে শ্বাস গ্রহণ, ধারণ ও ত্যাগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিই প্রাণায়াম। যোগশাস্ত্র অনুযায়ী নাকের মাধ্যমে ফুসফুসে বাতাস পূরণ করে ধারণ এবং ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে দেওয়ার বিশেষ নিয়মবদ্ধ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাণায়াম করা হয়। ফুসফুসে ভিতরে বায়ুর প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের প্রক্রিয়ার দ্বারা শরীরে বায়ুর বিস্তার ঘটে। তার নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াই হলো প্রাণায়াম। এই নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। —পূরক, অন্তঃকুম্ভক, ও বাহ্য কুম্ভক রেচক। দেহের প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করে জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর হাত থেকে দেহকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রাণায়াম করা হয়।

ফুসফুসের ব্যায়ামের ক্ষেত্রে প্রাণায়াম অত্যন্ত ফলপ্রসু। প্রাণায়ামের ফলে প্রায় কুড়ি প্রকার কফ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। প্রাণায়াম স্নায়ুকে অত্যন্ত সক্রিয় ও সবল করে থাকে। প্রাণায়ামের সঙ্গে খুব সহজ কয়েকটি আসন করলে খুব ফলপ্রসু হয়— (১) প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিংবা ধ্যান করার মতো করে আসন করে বসতে হবে। (২) ধীরে ধীরে নাক দিয়ে যতটা সম্ভব বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। (৩) যেমন করে ধীরে ধীরে শ্বাস নেওয়া হয়েছে তেমনি ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে (হা করে) ছাড়তে হবে। এইভাবে দিনে তিন মিনিট/পাঁচ মিনিটে যতবার ইচ্ছা নিঃশ্বাস নিতে হবে এবং ছাড়তে হবে।

এক্ষেত্রে মনে রাখার মতো বিষয় হলো, নিঃশ্বাস নিতে হবে নাক দিয়ে কিন্তু নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে মুখ দিয়ে। যতটা সময় ধরে নিঃশ্বাস নেওয়া হয়েছে ততটা সময় ধরে ছাড়তে হবে। প্রাণায়াম যেহেতু ধ্যানেরই একটি বিশেষ প্রকার, তাই এর নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যোগাসন বা ধ্যানের উপকারিতা সম্পর্কে আমরা কম-বেশি সবাই জানি। কিন্তু প্রাণায়ামের উপকারিতাও অপরিসীম। স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন শ্বাস ত্যাগ করার পর শ্বাস গ্রহণ করি, তখন ফুসফুসে যে পরিমাণ বাতাস প্রবেশ করে, তাতে ফুসফুস মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ প্রসারিত হয়। কিন্তু প্রাণায়াম করার মাধ্যমে ফুসফুস সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করা যায়। শরীরে প্রচুর পরিমাণ বাতাস প্রবেশের সুযোগ পায়। ফলে শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন পায়। শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে রক্ত চলাচল সঠিকভাবে হয়, হৃদযন্ত্র ভালোভাবে কাজ করতে পারে। এক কথায় শরীরের যন্ত্রাংশ যখন ভালোভাবে কাজ করে তখন শরীরের অনেক রোগ, ব্যাধি দূর হয়ে যায়।

কেবলমাত্র একটা দিনের জন্য নয় প্রতিদিন একটা অভ্যেস গড়ে তোলা, যাতে সারা দিনে অন্তত ত্রিশ মিনিট সময় বের করা যায় যোগাভ্যাসের জন্য। সুস্থ জীবনের জন্য যোগাভ্যাস খুব জরুরি। □

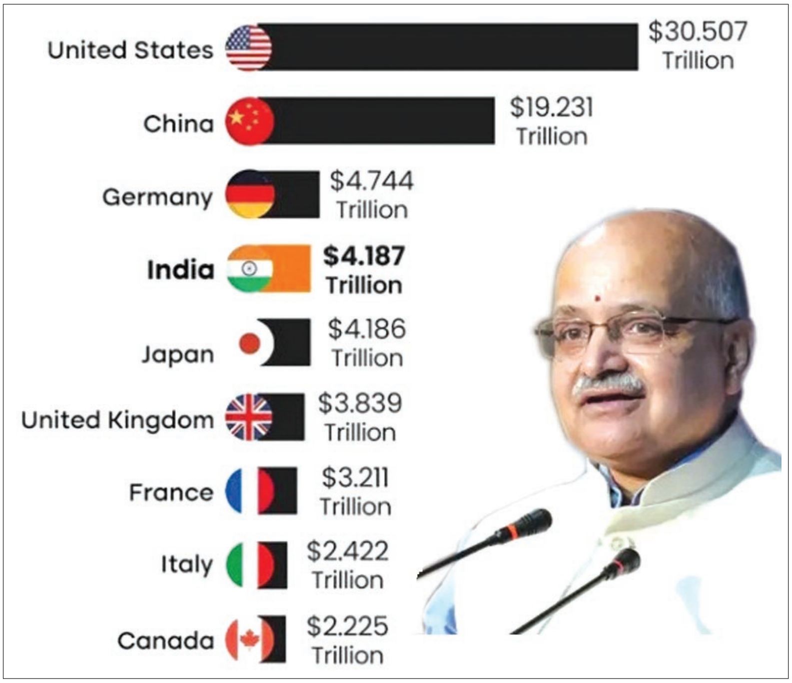

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি আজ ভারত

কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য (অব.)

'২০২৫ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক রিপোর্টে' আইএমএফ (ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড বা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার) ইঙ্গিত দেয় যে, ২০২৫ সালে ভারতের নমিনাল জিডিপি (অর্থাৎ বাজারমূল্যে উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবার মোট মূল্যমান) দাঁড়াবে ৪.১৮৭ ট্রিলিয়ন ডলার (ট্রিলিয়ন অর্থ— লক্ষ কোটি)। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ২০২৫ সালের শেষে জাপানের ৪.১৮৬ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে ভারত। 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া' বা নীতি আয়োগের বর্তমান সিইও বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম জানিয়েছেন, 'সামগ্রিকভাবে ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ভারতের পক্ষে অনুকূল রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ভারত। ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বৃহৎ অর্থনীতি আজকের ভারত।' তিনি বলেন, 'আমরা যা পরিকল্পনা করেছি এবং যা ভাবনাচিন্তা হচ্ছে, সেই অনুযায়ী সব ঠিক ঠাক চললে আগামী আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে আমরা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হব।'

বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতি কিছু মুষ্টিমেয় শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই শক্তিগুলির প্রভাব আজ বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। এই শক্তিগুলির দ্বারা বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে। এই শক্তিগুলি হলো মূলত কিছু হাতে গোনা বৃহৎ অর্থনীতি তথা দেশ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থব্যবস্থা পরিচালনা এবং আর্থিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই শীর্ষ অর্থনীতিগুলির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের দিকনির্দেশনার বিষয়টিও নির্ধারণ করে থাকে এই বৃহৎ আর্থিক শক্তিগুলি। আইএমএফ প্রকাশিত বিশ্ব অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন বা 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক রিপোর্ট'-এ বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সালে বিশ্বের ১০টি বৃহত্তম অর্থনীতিতে বিবর্তন ও বৃদ্ধির বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, এই বৃহৎ অর্থনীতিগুলি তাদের জিডিপি ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে গিয়েছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উৎপাদন বা গ্লোবাল ইকোনমিক আউটপুট-এর বেশির ভাগটাই তাদের অবদান।

বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে প্রথম স্থান হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। তারপরেই রয়েছে চীন। যদিও বিশ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ কমছে। এই পরিস্থিতিতে জাপানকে অতিক্রম করে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়ে সংবাদ শিরোনামে এসেছে ভারত। ভারতের এই আর্থিক বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো। সময়ের সঙ্গে, দ্বিগুণ বা তিনগুণ— কোনো একটি নির্দিষ্ট হারে কোনো কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তাকে বলা হয়--- 'এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ'। বিগত এক দশক ধরে ভারতীয় অর্থনীতি অর্জন করে চলেছে এই এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ। নির্দিষ্ট হারে, একনাগাড়ে আর্থিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকায় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব হয়েছে ক্রমবর্ধমান। বৃহৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে র‍্যাঙ্কিং (অর্থাৎ পদ বা স্থানাধিকার)-এর বিষয়টি বিভিন্ন দেশের নমিনাল জিডিপি-র দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে বাজার বিনিময় হার বা বাজারমূল্য (মার্কেট এক্সচেঞ্জ রেটস্)-এর ভিত্তিতে বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। সেই মোট মূল্যমান পরিমাপ করা হয় মার্কিন ডলারে। আইএমএফ প্রকাশিত, বিভিন্ন দেশের নমিনাল জিডিপি-র তথ্য আধারিত এই রিপোর্টগুলি আন্তর্জাতিক স্তরের বৃহৎ অর্থনীতিগুলির একটি বাস্তবসম্মত বিবরণ তুলে ধরে। এই রিপোর্টগুলির মাধ্যমে এই দেশগুলির অর্থনৈতিক শক্তির একটি

ফঃ ৫

তুলনামূলক বর্ণনাও পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি-র পরিমাণ হলো ৩০.৫০৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এই পরিমাণ জিডিপি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিনি আধিপত্যের তিনটি মূল ভিত্তি বিদ্যমান। কনজিউমার বা উপভোক্তাদের বিপুল ব্যয়, উদ্ভাবনী শক্তি এবং নানাপ্রকারের শিল্পক্ষেত্র সমন্বিত মার্কিন অর্থনীতি হলো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি। আমেরিকার মাথাপিছু জিডিপি হলো ৮৯,১০৫ ডলার, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই পরিমাণ মাথাপিছু জিডিপি উন্নত জীবনযাত্রার সূচক। উন্নত দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিংশ শতাব্দী থেকে এখনও পর্যন্ত শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে মার্কিন অর্থনীতি। চীন ধীরে ধীরে উঠে এলেও প্রযুক্তি, অর্থ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু যোজন এগিয়ে রয়েছে।

চীন : ২০২৫ সালে চীন হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। চীনের জিডিপি হলো ১৯.২৩১ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থনীতির নানা মাপদণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে পিছিয়ে থাকলেও বিশাল শিল্পক্ষেত্র এবং বিপুল সংখ্যক উপভোক্তার কারণে দেশটির আর্থিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে চীন। দেশটির মাথাপিছু জিডিপি হলো ১৩, ৬৫৭ ডলার। পরিকাঠামো, উৎপাদন ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অনবরত বিনিয়োগ চীনকে একটি বড়ো মাপের অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেছে। আর্থিক ক্ষেত্রে এই উন্নতি অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হয়তো ছাড়িয়ে যেতে পারে চীন।

জার্মানি : বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হলো জার্মানি। এই দেশটির জিডিপি হলো ৪.৭৪৪ ট্রিলিয়ন ডলার। দেশটির অর্থনৈতিক ভিত্তি হলো ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। দেশটির অর্থনীতি রপ্তানি-নির্ভর। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য দেশ হিসেবে এই গোষ্ঠীতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকে জার্মানি। দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ৫৫,৯১১ ডলার। এই পরিমাণ মাথাপিছু জিডিপি দেশটির বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা এবং নাগরিকদের উচ্চমানের জীবনযাত্রার নির্দেশক। উদ্ভাবনী শক্তি ও সুষম উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বদানই হলো জার্মানির অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক অবস্থানের মূল সোপান।

ভারত : এই বছর জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ভারত। বর্তমানে ৪.১৮৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছে ভারতের জিডিপি। মাথাপিছু জিডিপি-র পরিমাণ ২,৯৩৪ ডলার। বিরাট জনসংখ্যার দেশ হওয়ার পাশাপাশি ভারতে দ্রুতগতিতে সংঘটিত হচ্ছে আর্থিক বৃদ্ধি। 'সার্ভিস সেক্টর' বা পরিষেবা ক্ষেত্রটি বর্তমানে ভারতে ক্রমবর্ধমান। পরিষেবা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প এবং বিপুল আভ্যন্তরীণ চাহিদা হলো ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। ভারতে মাথাপিছু জিডিপি তুলনামূলকভাবে কম হলেও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত হলো একটি প্রবল সম্ভাবনাময় অর্থনীতি। আগামীদিনে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের ভূমিকা হতে চলেছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জাপান : ৪.১৮৬ ট্রিলিয়ন ডলার জিডিপি-সহ ভারতের ঠিক পরেই পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে জাপান। দেশটিতে মাথাপিছু জিডিপি-র পরিমাণ ৩৩,৯৫৫ ডলার। মাথাপিছু জিডিপি-র এই উদাহরণটি একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজের সূচক। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জাপানের আর্থিক বৃদ্ধি ধীরগতিতে হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তি, উৎপাদন শিল্প ও অর্থায়নে (ফিনান্স) অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে চলেছে জাপান। জাপানের জনসংখ্যার গড় বয়স হলো ৪৯.১ বছর। এই বয়স্ক জনসংখ্যার মতো চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হলেও উদ্ভাবনী শক্তি এবং বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ও উপস্থিতির কারণে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনৈতিক স্তরে পঞ্চম স্থান ধরে রেখেছে জাপান।

আইএমএফ প্রকাশিত প্রতিবেদনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক বৃদ্ধি হতে চলেছে ২.৮ শতাংশ, যা আগের অনুমানের থেকে ০.৫ শতাংশ কম। ২০২৬ সালে বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধি ৩ শতাংশ হতে পারে বলে আইএমএফ-এর অনুমান।

নীতি আয়োগ : ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় নীতি আয়োগ। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের স্থানটি নেয় এই সরকারি সংস্থাটি। কেন্দ্রীয় স্তরে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হয়ে ওঠে নীতি আয়োগ। দেশজুড়ে 'কো-অপারেটিভ ফেডারেলিজম' বা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নীতি আয়োগ। নিম্নস্তরে বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের উপর কাজ শুরু করে উপরের স্তরে, বৃহদাকারে তা নিয়ে যাওয়ার নীতি বা 'বটম-আপ অ্যাপ্রোচ' গ্রহণ করে সংস্থাটি। নীতি প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পাশাপাশি সুষম উন্নয়ন এবং সেই উন্নয়নযজ্ঞে সকলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিতেও জোর দেয় নীতি আয়োগ।

নীতি আয়োগের নিয়মানুযায়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন এই সংস্থার চেয়ারপার্সন। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভাইস-চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হয়ে থাকেন। সারা দেশের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে নীতি আয়োগে। সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সব ক'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপ-রাজ্যপাল হলেন নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য। '২০৪৭ সালে বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত রাজ্য'-শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে নীতি আয়োগ। তাদের দীর্ঘমেয়াদী নীতি সংবলিত এই অ্যাপ্রোচ পেপারে জানানো হয়েছে যে, একদা বিশ্বের পাঁচটি ভঙ্গুর বা বিমারু অর্থনীতির মধ্যে ভারত অন্যতম হলেও গত এক দশকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে স্থানাধিকার করেছে

ভারত। ২০২৪-২৫-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, যেসব দেশে মাথাপিছু আয় ১৪,০০৫ ডলারের বেশি, সেই দেশগুলিকে উচ্চ-আয়ের দেশ হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকে বিশ্বব্যাংক। উচ্চ-আয়সম্পন্ন দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় রয়েছে ভারতের এবং সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে বর্তমান ভারত। অ্যাপ্রোচ পেপারে বলা হয়েছে যে, ২০৪৭ সালে ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে ভারত। এই অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণাপত্রটিতে জানানো হয়েছে যে, একটি উন্নত দেশের সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকবে ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের। দেশের মাথাপিছুর আয় হবে অধুনা বিশ্বের উচ্চ-আয়ের দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয়। এই লক্ষ্যে ৬টি প্রধান ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে দেশজুড়ে জারি থাকবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা সংস্কার। ৬টি ভিত্তিকে কেন্দ্র করে ২৬টি বিষয় আবর্তিত হবে। মূল ভিত্তিসমূহকে ঘিরে থাকবে বিষয়গুলি।

৬টি প্রধান ভিত্তি হলো :

(১) ম্যাক্রো-ইকোনমিক (সামষ্টিক-অর্থনৈতিক) লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য আর্থিক নীতি।

(২) সামাজিক ক্ষমতায়নের ফলে অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক সমাজ।

(৩) একটি সমৃদ্ধ ও সুষম অর্থনীতি।

(৪) তথ্য-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন নেতৃত্ব।

(৫) বিশ্ববন্ধু : 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর নীতি অনুসরণে 'বিশ্ব একটি পরিবার'-এই ধারণার প্রতিষ্ঠা

(৫) সুশাসন, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রদান— উন্নত দেশ নির্মাণের লক্ষ্যে এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব।

তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর বর্তমান ভারত :

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আজ একটি মাইলফলক অতিক্রমে সক্ষম হয়েছে ভারত। একটি 'অল্টারনেটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং হাব' বা বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বর্তমান ভারত। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি মন্তব্য করেন যে, আমেরিকার বিক্রি হওয়া আইফোনগুলি ভারতের মতো কোনো দেশে নয়, আমেরিকাতেই তৈরি হওয়া উচিত। তাঁর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শুল্কনীতির বিস্তারিত বিবরণ এখনও অস্পষ্ট। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলেও প্রতিযোগিতামূলক-ভাবে, অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে নানা পণ্য উৎপাদনের ভিত্তিভূমি প্রদান অব্যাহত রাখবে ভারত।' তিনি জানিয়েছেন, 'অ্যাসেট মানিটাইজেশন' বা বিভিন্ন সম্পদ নগদীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছে ভারত সরকার। এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা বর্তমানে সরকার ও নীতি আয়োগের বিবেচনাধীন। দ্বিতীয় দফায় 'সম্পদ নগদীকরণ কর্মসূচি' ঘোষণার লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে কেন্দ্র। এই বছরের আগস্ট মাসে এই কাজটি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

"আগামী দু'বছরে ভারত হবে বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেখানে বার্ষিক আর্থিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৬ শতাংশেরও বেশি। এই সুষম আর্থিক প্রগতির ফলে ২০২৮ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) বেড়ে হবে ৫.৫৮ ট্রিলিয়ন ডলার। জার্মানিকে ছাড়িয়ে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।"

'চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি'র শিরোপা লাভের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মাইলফলকটি অতিক্রমের সময়টিও রাজনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন বা বিশ্বব্যাপী পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় নিজের ভূমিকা আরও মজবুত করতে বর্তমানে তৎপর হয়েছে ভারত। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র বার্তা প্রচারের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ টানতে ঝাঁপিয়েছে বর্তমান ভারত।

২০২৫ সালে জার্মানির আর্থিক বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় পৌঁছাবে বলে জানিয়েছে আইএমএফ। ২০২৬ সালে জার্মানির আর্থিক বৃদ্ধি ০.৯ শতাংশে দাঁড়াবে বলেও আইএমএফ-এর পূর্বাভাস। চলমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে জার্মানির অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বলে ধারণা পোষণ করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি-র পরিমাণ এই বছর ৩০.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চীনের জিডিপি প্রায় ১৯.২ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

একটানা কয়েক বছর ধরেই বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি (ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমি)-র স্থানটি অধিকার করে রয়েছে ভারত। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা অনুযায়ী, আগামী দু'বছরে ভারত হবে বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেখানে বার্ষিক আর্থিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৬ শতাংশেরও বেশি। এই সুষম আর্থিক প্রগতির ফলে ২০২৮ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) বেড়ে হবে ৫.৫৮ ট্রিলিয়ন ডলার। জার্মানিকে ছাড়িয়ে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

(লেখক 'অখিল ভারতীয় পূর্বসৈনিক সেবা পরিষদ'-এর রাজ্য সভাপতি)

নতুন মাইলফলক অতিক্রম করল ভারতীয় অর্থনীতি

অর্ণব কুমার দে

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের অর্থনীতি : যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে গেলে তার জিডিপি-র উপর চোখ রাখতে হয়। জিডিপি হলো গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, অর্থাৎ দেশে কত পণ্য ও পরিষেবা উৎপন্ন হচ্ছে তার অর্থমূল্যের মোট যোগফল। যত রকম কৃষিজ পণ্য, খাদ্যদ্রব্য, ভারী শিল্প, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্পের দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী (Industrial Product) ইত্যাদি বস্তু ও দেশে উৎপাদিত পরিষেবার সম্মিলিত অর্থমূল্যকে জিডিপি বলা হয়।

আমদানির পরিমাণ রপ্তানির থেকে বেশি হলে অর্থ বিদেশের হাতে চলে যায় আর বিপরীতে দেশের লাভ। স্বাধীনতার সময়কাল থেকে ভারতকে বহু সামগ্রী আমদানি করতে হতো, তার ফলে দেশের অর্থ বিদেশিদের হাতে চলে যেত। স্বাধীন হবার ১৫ বছর পরেও ভারত মূলত চা, চাল, মশলা, তুলো, পাট বা খনিজ পদার্থ রপ্তানি করতো। বিভিন্ন দেশ এইসব দ্রব্য বাজারজাত করে, তার একাংশ ভারতে অনেক বেশি দামে বিক্রি করত। ভারতে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ না হওয়ার দরুন অনেকগুলি দেশ ভারত থেকে সস্তায় কাঁচামাল কিনে, তা ব্যবহার করে নানা পণ্য উৎপাদন করে ভারতে রপ্তানি করত। সত্তরের দশকে এসে পেট্রোলের চাহিদা বাড়তে থাকলো। বিপুল পরিমাণে খনিজ তেল আমদানি করতে শুরু করল ভারত। তাতে ভারতের অর্থনীতির উপর চাপ বাড়তে লাগলো।

বিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় অর্থনীতি : নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এবং চিরাচরিত প্রথায় অর্থনীতির সঙ্গে চরম দুর্নীতির কবলে পড়ে ভারতীয় অর্থনীতি প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থায় পৌঁছে যায়। ১৯৯০-এ ভারতের 'বাজেট ডেফিসিট' অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের

> ভারত আজ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে এবং চতুর্থ স্থান থেকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আয়ের থেকে ব্যয় তিন শতাংশের বেশি বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক ঋণ শোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ভারতীয় অর্থনীতিকে স্বাধীনতার পর থেকেই পূর্ণ রূপে ক্যাপিটালিস্ট বা সোশ্যালিস্ট অর্থনীতি হিসেবে গণ্য করা হতো না। মিক্সড ইকোনমি' বা মিশ্র অর্থনীতির দেশ ভারত এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করতো। কিন্তু ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত ভোট-রাজনীতির কারণে সরকারি চাকরিতে মাত্রাতিরিক্ত নিয়োগ (Redundant Labour), বিভিন্ন পদে অযোগ্য ব্যক্তিদের বহাল করা এবং প্রশাসনের শীর্ষস্তরের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের থাকার কারণে ভারতের অর্থনীতির অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে।

ভারতে সরকারে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙে পড়ে ১৯৮৯ সালে। যে জোট সরকারটি ক্ষমতায় আসে তারাও ভারতীয় অর্থনীতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকারে আঞ্চলিক দল ও বামপন্থীদের প্রভাব থাকায় সরকারি কোষাগারে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টি না থাকাটাই স্বাভাবিক। এই দু'রকম রাজনৈতিক দলের ভাবধারায় শিল্প ও বাণিজ্য কখনোই স্থান পায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমানে শিল্প ও বাণিজ্য ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব। তিন বছরের জোট সরকারের পতন হলে ১৯৯২-তে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসে। সে সময় নরসিংহ রাও, প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং ড. মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে ভারতে শুরু হয় আর্থিক সংস্কার। গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত। দেশের বায়ুহীন অর্থনীতিতে অক্সিজেনের জোগান দেন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও। এর পর প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ভারতে সরকারি সংস্থা বিলগ্নীকরণ শুরু হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাড়তে থাকে বেসরকারি বিনিয়োগ। বিরোধীরা উচ্চকণ্ঠে এই প্রথার বিরোধিতা করে, কিন্তু সে সময় সাবেকি অর্থনীতির থেকে সরে আসা ভারতের পক্ষে কতটা লাভজনক তা বুঝতে সক্ষম হয়নি ভারতবাসী। দেশজুড়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এনডিএ সরকার ২০০৪-এ জনমত ধরে রাখতে অক্ষম হলেও 'সোনালি চতুর্ভুজ' প্রকল্পের দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারতের যে রাস্তা অটলজী দেখিয়েছিলেন, তা আজ দুই দশক বাদে ভারতবাসী অনুধাবন করছে।

২০০৪ পরবর্তী সময় : ভারত বিশ্বের যত বড়ো অর্থনীতিই হোক না কেন বামপন্থীদের তা সহ্য হয় না। ৬৩ জন সাংসদ নিয়ে তারা ড. মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে সমর্থন করলেন। ভারতের উন্নতির যে

মূলসুরটি অটলজী বেঁধে দিয়েছিলেন তার ফলে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল। তাকে বাড়িয়ে তোলার কাজ না করলেও অস্বীকার করতে পারেনি ইউপিএ সরকার। দেশজুড়ে টেলিফোন লাইনও ছড়িয়ে পড়ে অটলজীর সময়েই। বিদেশনীতিতে অটলজীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের সাফল্যের কারণে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যের পথটিও সুগম হয়। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ প্রয়োজন, তাই তদানীন্তন সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করতেই, নানা অজুহাত খুঁজে অকর্মণ্য বামপন্থীরা সরকার থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের অস্থিরতার কারণে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা ধাক্কা খায়। ভারতে ২জি ও কয়লা কেলেঙ্কারির মতো বেশ কিছু দুর্নীতির পর্দাফাঁস হয়। চরম সমালোচনার মুখে পড়ে ড. সিংহের সরকার এবং ২০১৪ সালে এই সরকারের পতন হয়।

২০১৪-র পরের ভারত : এই সময় থেকে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বেশ কিছু ফাঁকফোকর বন্ধ করে দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু অর্থব্যবস্থার ভেতর জমে থাকা ময়লা যেন পরিষ্কার হতেই চায় না। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে 'ডিমানিটাইজেশন' করে দেশের শত্রুদের উপর বজ্রাঘাত হানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জালনোটের ব্যবসা, কর ফাঁকি দেওয়ার চক্রের উপর কঠোর আঘাত করলেন। ২০১৭ সালে নিয়ে এলেন জিএসটি। এর ফলে বহু জায়গা থেকে কর ফাঁকি দেওয়ার যে সুবিধা ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। ছোটো ব্যবসায়ীদের ছাড় দিয়ে বড়ো ব্যবসায়ীদের থেকে জিএসটি আদায়ের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক পরিবর্তন আসতে থাকলো। বিগত দশকে প্রচুর অনাদায়ী ঋণের ফলে ব্যাংকগুলির কাছে ছিল সেই ঋণের বিনিময়ে বন্ধক থাকা বিপুল পরিমাণ জমি ও সম্পত্তি। সমস্যা হলো ব্যাংকের অধিগৃহীত ফ্ল্যাট বা জমিগুলি ছিল বাজারমূল্য থেকে বেশি দামের। ২০১৯ সালে ব্যাংক মার্জার এবং এনপিএ-র পরিবর্তে অধিগ্রহণ করা সম্পত্তিগুলি নিলাম করিয়ে ব্যাংকগুলিকে অনেকটা চাঙ্গা করে তুলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নেওয়া হয়েছে নানা সদর্থক পদক্ষেপ। দেশীয় বড়ো বিনিয়োগকারীদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বা পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগে উৎসাহদান এবং ছোটো ব্যবসায়ীদের মুদ্রা লোন বা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে ভারতে ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে, ভারতীয় অর্থনীতি হয়ে উঠছে মজবুত। ভারতমালা প্রকল্পের ফলে বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছে। রেল পরিষেবার উন্নতি ঘটেছে। রেলের অযাচিত খরচ হ্রাস সম্ভব হয়েছে। ভারত অর্থনৈতিক স্তরে আর একটি পদক্ষেপ নিয়েছে, তা হলো বেশ কিছু দেশের সঙ্গে ভারতের ও তাদের মুদ্রাতে আমদানি-রপ্তানির চুক্তি করেছে ভারত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডলারের ব্যবহার করলে লাভবান হতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের রুপে কার্ড ও ভিম ইউপিআই অ্যাপও ডলার নির্ভরতা হ্রাসে সহায়ক হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদী হামলা : ২০১৯ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে কাশ্মীরের পুলওয়ামাতে আধাসেনা কনভয়ের উপর সংঘটিত হয় এক সন্ত্রাসবাদী হামলা। এরপর ভারত পাকিস্তানের বালাকোটে বায়ুসেনা অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৩০০ জনের মতো সন্ত্রাসবাদীকে খতম করে এই কাপুরুষোচিত হামলার বদলা নেয়।

ভারত ইজরায়েলের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তোলে 'ব্রহ্মোস' নামক এক মারণবাণ। একইসঙ্গে গড়ে তোলে ত্রিস্তরীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। মারণাস্ত্রের ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়; জানা যায় তা কত দূর অবধি সঠিক নিশানায় আঘাত করতে পেরেছে বা তার ধ্বংসের ক্ষমতা কতটা। কিন্তু যুদ্ধ না হলে 'ডিফেন্স সিস্টেম' পরীক্ষা করা কঠিন হয়। যুদ্ধে ব্যবহৃত হলে তা হয়ে ওঠে 'ওয়ার টেস্টেড'। বর্তমানে প্রতিরক্ষা রপ্তানির জন্যে তৈরি হচ্ছে ভারতের 'ব্রহ্মোস'। যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টির আগেই রাশিয়াতে তেলের খনিতে প্রায় ৮০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিস্থিতিতে রাশিয়ার তেল ও গ্যাস বয়কট করে। ভারত রাশিয়া থেকে তেল (ক্রুড অয়েল) কিনে, পরিশোধন করে তা ইউরোপের বাজারে বিক্রি শুরু করে।

এ নিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে বিদেশমন্ত্রী সোজা জবাব দেন ভারত পরিশোধিত তেল বিক্রি করছে। এটা ভারতীয় প্রোডাক্ট। ভারত কার কাছ থেকে কিনছে সেটা কারুর দেখার বিষয় নয়। মিডল- ইস্ট বা মধ্যপ্রাচ্যের ক্রুড অয়েল এবং রাশিয়ার ক্রুড অয়েল আলাদা। ভারত দুই ধরনের তেল পরিশোধনে সক্ষম। এই কারণে সৌদি আরবের তেল প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যারামকো ভারতের তৈল শোধনাগার শিল্পে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়েছে।

ভারত রাশিয়াকে এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অর্ডার দেওয়ায় মার্কিন প্রশাসন ক্ষুব্ধ হয়েছে। বিশ্বের অস্ত্রের বাজারে রাশিয়া মার্কিনিদের টক্কর দিলে তাদের বাজার নষ্ট হবে, তাই মার্কিনিরা ভারতের বিরুদ্ধে না গেলেও সহজভাবে বিষয়টি গ্রহণ করেনি। মার্কিনিরা এর আগে ভারতকে যুদ্ধবিমান বিক্রির চেষ্টা করছিল। ভারতের বর্তমান সরকার সেনাকে পেছনে রেখে অস্ত্র চুক্তি করার বিপক্ষে, সেই কারণে মার্কিনি বিমান বাতিল হয়ে ফ্রান্সের 'রাফাল' অগ্রাধিকার পেয়েছে। এই অবস্থায় ভারতকে অস্থির করার লক্ষ্যে পহেলগাঁওয়ে চালানো হয় সন্ত্রাসবাদী হামলা। মার্কিনিরা বিশ্বের অস্ত্রের বাজারে বড়ো মাপের মুনাফা করতে পারছে না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশকে অশান্ত করে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সক্রিয় রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের আর্থিক উন্নতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল গাত্রদাহ। তাই মার্কিন মদতে ভারতকে পশ্চিম সীমান্তে ব্যস্ত রাখার জন্যে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা পহেলগাঁওয়ে হামলার ছক কষে পাকিস্তান।

ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর ও সেনাবাহিনী পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের যোগ্য জবাব দেয়। 'অপারেশন সিঁদুর' নামক ভারতীয় সামরিক অভিযানে ভারতের ত্রিস্তরীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ও ইসরোর দক্ষতা দেখে চমকে ওঠে বিশ্ব। এর ফলে পশ্চিমি শক্তির চাল বিশেষ কার্যকরী হয় না। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক বাজারে মন্দার বদলে খুলে যায় এক অন্য দিগন্ত। ভারতের 'আকাশ' এয়ার ডিফেন্স মিসাইলের চাহিদা বিশ্ববাজারে আলোড়ন ফেলে দেয়। ভারত যে তিন দিনে যুদ্ধ শেষ করবে একথা বিশ্বের অনেক দেশ ভাবতেও পারেনি। সেই যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝেই ভারত ফ্রি-ট্রেড এগ্রিমেন্ট করে ইউ কে-র সঙ্গে। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত-ব্রিটেন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ হবে ৬০ বিলিয়ন ডলারের দ্বিগুণ। এছাড়াও ভারতের ইসরো অনেক দেশের স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়েও বিশ্বের বাজারে একটি বিশেষ স্থান অর্জন করেছে। এই সবকিছুর সমন্বয়ে আজ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে ভারত, এবং চতুর্থ স্থান থেকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ভারতের এই জয়যাত্রা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, একজন ভারতীয় হিসেবে ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা করা উচিত সকলের। □

গুপ্তধন

এক কৃষক ছিল। সারাদিন জমিতে কাজ করত। খুব পরিশ্রম করতে পারত। তার পরিবারে কোনোরকম অভাব ছিল না। চাষবাসের সমস্ত খুটিনাটি তার জানা ছিল। সেজন্য তার জমিতে সোনার ফসল ফলত।

কিন্তু কৃষকের মনে একটাই দুঃখ, তার ছেলেরা খুবই অলস। এমনিতে তারা বেশ ভালো, সুস্থ সবল। মা-বাবাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। কিন্তু হলে কী হবে! কাজের কথা বললেই তাদের মুখ ভার। কৃষক বারবার বুঝিয়েও কোনো লাভ হয়নি। মাঠে যাওয়া তো দূরের কথা, কিছুতেই তারা চাষের কাজে বাবাকে সাহায্য করে না। এমনকী শিখতেও চায় না। বকাবকি করেও কোনো লাভ হয় না। তাই তার খুব চিন্তা। সে তো একদিন চোখ বুজবেই। তখন কীভাবে ছেলেদের ভাত জুটবে কে জানে! এইসব চিন্তায় তার রাতে ঘুম আসে না।

এভাবে চিন্তায় দিন কাটতে কাটতে কৃষক একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন তার ছেলেরা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দিন-রাত তারা বাবার সেবাযত্ন করতে লাগল। তাসত্ত্বেও তার অবস্থা খারাপ হতে লাগল। সে বুঝতে পারল আর বেশিদিন তার আয়ু নেই। তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

কৃষক তার ছেলেদের ডেকে পাঠাল। একে একে তারা সবাই রোগশয্যায় বাবার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। কৃষক তখন তাদের বলল, বাবারা শোন, এতদিন তোমাদের বলিনি, আমার বেশ কিছু ধনসম্পদ আছে। সেগুলি আমি জমিতে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছি। তোমরা সেগুলো তুলে এনে নিজেরা সংসার চালাবে। এই বলেই কৃষক চোখ বন্ধ করল।

ছেলেরা তখন এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এমন একটা খবর বাবা তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন! তারা ব্যস্ত হয়ে বলল, কোন জমিতে কোথায় আছে বাবা? কিন্তু ততক্ষণে কৃষক শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। ছেলেরা সঠিকভাবে জানতে পারল না জমির ঠিক কোথায় গুপ্তধন রাখা আছে।

কিছুদিন পরে, বাবার শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পর, ছেলেরা আলোচনা করতে বসল, কী করা যায়? কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে গুপ্তধন? শেষে তারা ঠিক করল বাবা তো বলে গেছেন, জমির মধ্যেই গুপ্তধন আছে। তাহলে এক কাজ করা যাক, পুরো জমিটা খুঁড়ে ফেলা যাক। তাহলেই যেটা ঠিক পাওয়া যাবে।

সেইমতো একদিন সব ভাই মিলে মাঠে চলে এল। ভালো করে সমস্ত জমি খুঁড়ে খুঁড়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কোথাও কোনো গুপ্তধনের হদিশ পেল না।

এক ভাই বলল, মনে হয় ভালো করে খুঁড়ে দেখা হয়নি। তখন তারা আবার পুরো জমি খুব ভালোভাবে চষে ফেলল। কিন্তু না, এবারও তারা কিছুই পেল না। তখন বৃথা পরিশ্রম করার জন্য তারা মৃত বাবার উপর রেগে গেল। বলতে লাগল, বাবা এত বড়ো মিথ্যে কথাটা কেন যে বলে গেলেন তা কে জানে? একে তারা অলস, কোনোদিন পরিশ্রম করার অভ্যাস ছিল না, তার উপরে মনের হাতাশা, সব মিলিয়ে তারা একেবারে মিইয়ে গেল।

শেষে এক ভাইয়ের মনে হলো, আচ্ছা, এত কষ্ট করে যখন মাটি কোপানোই হলো, তখন বীজ ছড়িয়ে দিলে কেমন হয়? যা কিছু হোক ফসল তো ফলবে? সবার মনে বেশ ধরল কথাটা। তারা তাই-ই করল। ভালো করে বীজ ছড়িয়ে দিল। তারপরে স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন বৃষ্টি এসে গেল।

অলস প্রকৃতির ছেলেরা বেশ কিছুদিন আর মাঠমুখো হয়নি। তাদের তো উৎসাহই আর অবশিষ্ট ছিল না।

বেশ কিছুদিন পর লোকের মুখে খবর পেয়ে তারা মাঠে গেল। গিয়ে তো তাদের চক্ষুস্থির। মাঠভর্তি সোনার ফসল। রোদে একেবারে ঝলমল করছে।

মনটা খুশিতে ভরে গেল তাদের। তাদের পরিশ্রম তাহলে ব্যর্থ হয়নি। তারা বুঝতে পারল, তাদের বাবা এই গুপ্তধনের কথাই তাদের বলেছিলেন। এটাই আসল গুপ্তধন। তারা তখন বাবার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিল।

ছোটো বন্ধুরা, পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। পরিশ্রম করলেই সফলতা এসে যায়। সেটাই গুপ্তধন।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

মাটিকেত্তন শোলা

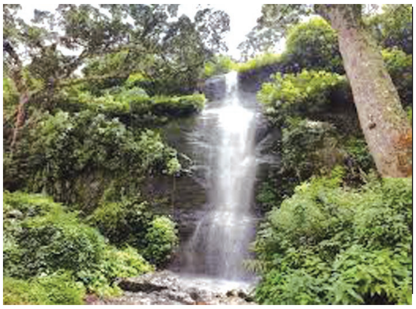

এই উদ্যান কেরালা রাজ্যের ইদুক্কি জেলার উদুমবানচোলা তালুকের পুপাড়া গ্রামে অবস্থিত। এটি ১২.৮২ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এটি একটি শোলাবন যা বিভিন্ন প্রকারের বনভূমি ও তৃণভূমি এবং পশু-পক্ষী বিশেষ করে হাতির আবাসস্থল। উদ্যানটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্যের জন্য পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। এটি চিরহরিৎ , আর্দ্র পর্ণমোচী, শোলাতৃণভূমি এবং অর্ধ চিরহরিৎ বনভূমি নিয়ে গঠিত। উদ্যানটি ২০০৩ সালে পরিবেশগত, প্রাণীজগৎ, পুষ্প ও বনজ সম্পদের জন্য জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মাটিকেত্তন নামটি তামিল শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হলো 'মন বিভ্রান্তিকর'। স্থানীয় মানুষেরা বলেন, এই বনে প্রবেশ করার পর যে কেউ পথ ভুলে যেতে পারে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭২

ঘটিদর্শনেন সময়-জ্ঞানম-৪

অভ্যাসং কুর্মঃ -

৫টা ০৫ বাজে --- পঞ্চ-অধিক-পঞ্চবাদনম্।

৫টা ১০ বাজে— দশ-অধিক-পঞ্চবাদনম্।

৫টা ২০ বাজে ---বিংশতিঃ-অধিক-পঞ্চবাদনম্।

৫টা ২৫ বাজে —পঞ্চবিংশতিঃ-অধিক-পঞ্চবাদনম্।

অভ্যাসং কুর্মঃ -

৪টা ৫৫ বাজে—পঞ্চ-ঊন-পঞ্চবাদনম্।

৪টা ৫০ বাজে—দশ-ঊন-পঞ্চ-বাদনম্।

৪টা ৪০ বাজে--- বিংশতিঃ ঊন-পঞ্চ-বাদনম্।

৪টা ৩৫ বাজে —পঞ্চবিংশতিঃ ঊন-পঞ্চ-বাদনম্।

ভালো কথা

কাকের ছানা

একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখি একটি কাকের ছানা রাস্তার ধারে চুপটি করে বসে আছে। এখনো উড়তে শেখেনি। কোনোভাবে বাসা থেকে পড়ে গেছে। গাছর উপরে অন্য কাকগুলো চিৎকার করে ডাকছিল। আমি ভাবলাম বেড়ালে ওটাকে মেরে ফেলবে। তাই কোনোরকমে ধরে বাড়িতে নিয়ে এলাম। মা একটা ভাঙা ঝুড়িতে ছানাটিকে রেখে বারন্দায় ঝুলিয়ে রেখে দিলেন। একটা বিস্কুট জলে ভিজিয়ে ওটার মুখের কাছে নিয়ে যেতেই লাল টুকটুকে মুখ হাঁ করে খেয়ে নিল। পরদিন সকালে উঠে আমি ওর কাছে যেতেই মুখ হাঁ করে খেতে চাইছে। রাতের বাসি রুটির টুকরো ওর মুখে দিতেই খেয়ে নিল। একটু পরেই দেখি ওটার ম-বাবা কোথা থেকে এসে ওকে খাইয়ে দিচ্ছে। আমরা ছানাটির কাছে গেলেও ভয় পাচ্ছিল না। সারাদিন ধরে ওর মা-বাবা মুখে করে খাবার এনে খাওয়াচ্ছিল। সাতদিন পর একদিন ছানাটি ওর ম-বাবার সঙ্গে উড়ে একটা গাছে গিয়ে বসল। তারপর কোথায় যেন উড়ে চলে গেল।

শ্রেয়া ঘোষাল, ষষ্ঠ শ্রেণী, বড়জোড়া, বাঁকুড়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) হা সা ম গ

(২) ক জ্জা জ ল

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ন না ণ র রা য়

(২) ড়ি ন শা বা ল ক

২ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) গোলাবারুদ (২) আসানসোল

২ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) মলিনবসন (২) যশোদানন্দন

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, ইবি, মালদা। (২) বর্ণিনী সরকার, বিএস রোড, ইবি, মালদা। (৩) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (৪) স্বপ্না মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®

EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত

শ্রী দীপক খাঁ

১৮২০ সালের ১৫ জুলাই বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামে অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন টালি নালার খাজাঞ্জি। পিতামহ বর্ধমান রাজবাড়িতে কর্মচারী ছিলেন। সেই সময় মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা ফার্সি শিখত চাকুরি পাবার আশায়। অক্ষয়কুমারের পিতা তাঁর ছেলেকে ফার্সি শেখবার জন্য আসিউদ্দিন মুনশীর কাছে ভর্তি করে দেন। এছাড়াও অক্ষয়কুমার গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের টোলে ভর্তি হন সংস্কৃত শেখবার জন্য।

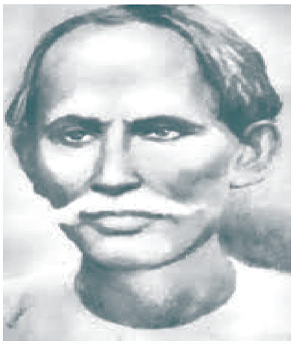

জীবন কারও সমান যায় না। অক্ষয় কুমারের পিতৃবিয়োগ হলে পরিবারে আসে চরম দারিদ্র্য। ফলে পড়াশোনা ছেড়ে অর্থ উপার্জনের পথে নামতে হয় অক্ষয়কুমারকে। নয়-দশ বছর বয়সে অক্ষয়কুমার কলকাতায় আসেন। অদ্ভুত ব্যাপার এই একই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও কলকাতায় আসেন। সালটা ১৮২৮। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে বঙ্গের সংস্কৃতি ও কাব্য জগতের কবি ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সাহায্যে বেশ তরুণ বয়সেই তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবি প্রতিভা এই সংবাদ প্রভাকরে সে যুগে তরুণ সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারীর মতো অনেক তরুণ ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের আলাপ হয় তাঁরই জেঠতুতো ভাই হরমোহন দত্তের মাধ্যমে। ঈশ্বর গুপ্ত নিয়মিত হরমোহনের কাছে যাতায়াত করতেন তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপাবার জন্য। সেখানেই একদিন অক্ষয় কুমারের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের আলাপ। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার নিয়মিত লেখা পাঠাতেন। ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিষ্টমত প্রচার-প্রসারের বিরোধিতা করা, কিছু নব্যশিক্ষিত হিন্দু যুবকদের সবধর্ম বিদ্বেষী মনোভাব সংযত করা এবং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল হওয়া প্রভৃতি ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। শ্রীধর ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিশচন্দ্র নন্দী এবং আরও অনেকে ছিলেন এই সভার সদস্য। এই সভা প্রতিষ্ঠার দু-একমাস পরেই ঈশ্বর গুপ্ত এই সভার সদস্য হন। একদিন অক্ষয় কুমার দত্ত ঈশ্বর গুপ্তকে সঙ্গে করে এই সভা দেখতে আসেন। সেই দিনই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচয় হয়।

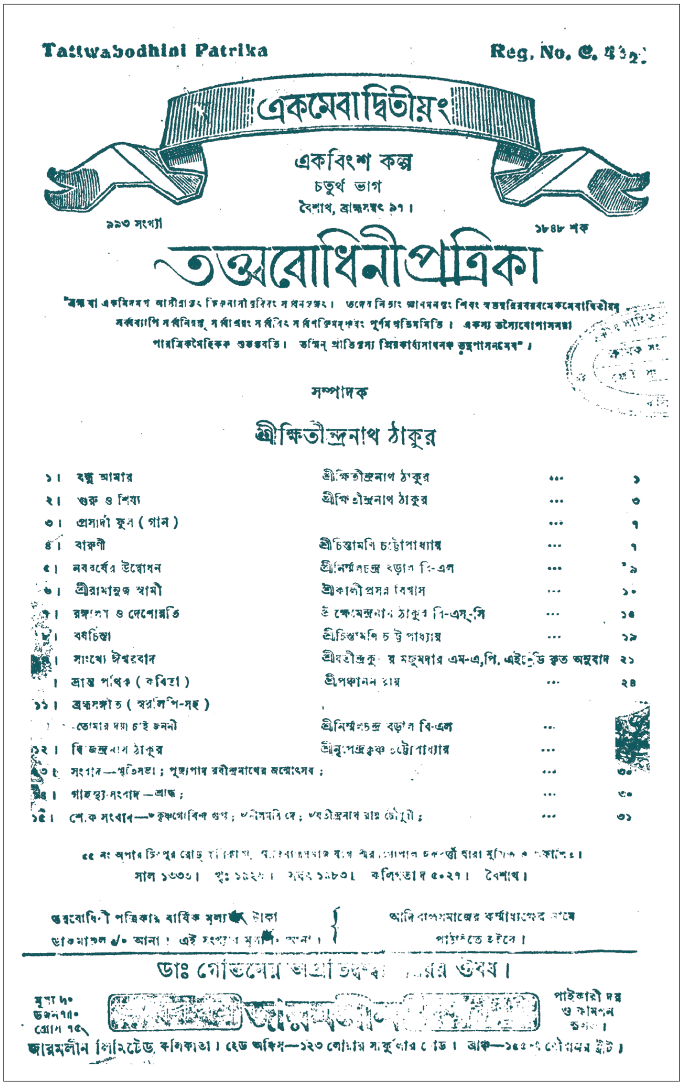

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 432

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৩ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। বন্ধু আমার	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১
২। গুরু ও শিষ্য	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩
৩। প্রসাদী ফুল (গান)		...	৭
৪। বারুণী	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	৭
৫। নববর্ষের উদ্বোধন	শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল	...	৯
৬। শ্রীরামানুজ স্বামী	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	...	১০
৭। রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি	শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্-সি	...	১৫
৮। বর্ষচিন্তা	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	১৯
৯। সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ	শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ,পি, এইচ্-ডি কৃত অনুবাদ		২১
১০। ভ্রান্ত পথিক (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন রায়	...	২৪
১১। ব্রহ্মসঙ্গীত (স্বরলিপি-সহ)			
তোমার দয়া চাই জননী	শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল	...	
১২। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	
১৩। সংবাদ—স্মৃতিসভা; পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব;		...	৩০
১৪। গার্হস্থ্য-সংবাদ—শ্রাদ্ধ;		...	৩০
১৫। শোক সংবাদ		...	৩১

সাল ১৩৩৩। বৈশাখ।

ডাকমাশুল ৵০ আনা।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

তত্ত্ববোধিনী সভার ভাবাদর্শ, স্বদেশপ্রেম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি অক্ষয়কুমারকে আকৃষ্ট করে। ফলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মানুষের সান্নিধ্যে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হয়ে যান। অক্ষয়কুমারের দায়িত্ববোধ, কর্মদক্ষতা, মননশীলতা প্রভৃতি দেখে দেবেন্দ্রনাথ তাকে তত্ত্ববোধিনী সভা পরিচালিত পাঠশালায় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এরই ফাঁকে ১৯৪১ সালে তিনি স্কুলপাঠ্য, পুস্তক বাংলা ও ভূগোল রচনা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা তা প্রকাশ করে।

১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র হিসাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অক্ষয়কুমার সভ্য নির্বাচিত হন। অবশ্য সম্পাদক নির্বাচন নিয়ে একটি ইতিহাস আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যারা পত্রিকার সম্পাদনার কাজে আগ্রহী—তাঁদের সকলকে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেন। প্রবন্ধের বিষয় ঃ 'বেদান্ত ধর্মানুযায়ী সন্ন্যাসী ধর্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ'। অক্ষয়কুমারের রচনা সৌষ্ঠব, গুণগত মান, তাঁর কর্মদক্ষতা লেখক ও সম্পাদক হিসাবে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা, এই সবই অক্ষয় কুমারকে সম্পাদক পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে একটি ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের মণে দ্বিধা ছিল সেটা হলো মতামতের ব্যাপারে হয়তো অক্ষয়কুমার সর্বক্ষেত্রে একমত পোষণ নাও করতে পারেন। তথাপি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে অক্ষয়কুমারকেই মাসিক ৩০ টাকা বেতনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার তুলে দেন।

তাঁর দক্ষ পরিচালনার গুণে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে সে যুগের একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় পরিণত করেন। পাশ্চাত্য পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং প্রমাণমূলক দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। পত্রিকা প্রকাশের ফলে তিনি এই সব বিষয়ের উপর নানা রকমের প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করতে থাকেন।

পত্রিকা প্রকাশের অল্প কিছুকাল পরে তখনও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ হননি, তখন থেকেই অক্ষয়কুমার তাঁর লেখাগুলি পাঠাতেন বিদ্যাসাগরের কাছে একটু দেখে দেবার জন্য। তখনও পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি লেখা পাঠাতেন পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ আনন্দকৃষ্ণ বসুর হাত দিয়ে। কেননা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আনন্দকৃষ্ণ বসুর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা বহুদিনের। তাঁর ইচ্ছার কথা আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে জানাতেই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। অক্ষয়কুমার এসে সাক্ষাৎ করলেন বিদ্যাসাগরে সঙ্গে। তাঁর লেখাগুলো দেখে দেবার জন্য তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই প্রথম দুই কর্মযোগী মানব প্রেমিকের মহামিলন ঘটল। তারপর তাঁরা একসঙ্গে হেঁটেছেন অনেকটা পথ। কখনও শিক্ষাপ্রসারের কাজে, কখনও নারী শিক্ষা বিস্তারে, কখনও বহুবিবাহ রোধে, কখনও-বা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে এই দুই বন্ধু কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করেছেন। এর মূল কারণ এঁরা দুজনেই ছিলেন ঘোর যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় বিশ্বাসী দেশপ্রেমী ও মানবতাবাদী।

প্রধানত অক্ষয়কুমারের আগ্রহেই বিদ্যাসাগর ১৮৪৮ সালের অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এরপরই বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করেন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তা প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

এরই মধ্যে ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর বাংলার ধর্ম আন্দোলনের চালচিত্তে ঘটে যায় একটি বিশেষ ঘটনা। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যগণ ব্রাহ্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, শ্রীধর ভট্টাচার্য, শ্যামচরণ ভট্টাচার্য, অক্ষয় কুমার দত্ত, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ২১ জন ব্রাহ্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের মতো একজন বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ কীভাবে নিজে ধর্মআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রাহ্মমতে দীক্ষা নিলেন সেটা ভাবতে অবাক লাগে। হয়তো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন কাণ্ডারি হিসাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। এখানেই বিদ্যাসাগর যে চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত তা দেখাতে পারেননি। মূলত, অক্ষয়কুমারের প্ররোচনাতেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গভীরভাবে শাস্ত্রানুসন্ধান করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজেও সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলাভাষার মাধ্যমে ঈশ্বর উপাসনার তিনিই অন্যতম প্রবর্তক। কিন্তু তাঁরই চারিত্রিক দৃঢ়তার ফলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একটি ধর্ম-আন্দোলনের মুখপত্র না হয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি অনুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। অক্ষয়কুমার সম্পর্কে খেদ প্রকাশ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'তিনি কোথায় আর আমি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ। আকাশ-পাতাল প্রভেদ।' অবশেষে ১৮৫৯ সালের মে মাসে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা তুলে দেন। তখন ওই সভার সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮৫৫ সালের ১৭ জুলাই বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তার মাসিক বেতন ১৬০ টাকা। নর্মাল স্কুলের নিজস্ব ঘর না থাকায় সংস্কৃত কলেজে সকালবেলা স্কুল হতো। দু' ঘন্টা ধরে চলতো সেই স্কুল। স্কুলটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ শ্রেণীর ভার ছিল অক্ষয়কুমারের উপর এবং নিম্নশ্রেণীর ভার ছিল মধুসূদন বাচস্পতির উপর। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭১ জন। তার মধ্যে ৬০ জনকে মাসিক পাঁচটাকা বৃত্তি দেওয়া হতো। ওখানকার ছাত্রদের বয়সসীমা

ছিল ১৭ বছর থেকে ৪৫ বছর। শকুন্তলা, কাদম্বরী, বোধোদয়, নীতিবোধ, চারুপাঠ, বাহ্যবস্তু, ভূবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও জীববিদ্যা ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। দুর্ভাগ্য, অক্ষয়কুমার প্রধান শিক্ষকের কাজ বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারেননি। তিন বছর অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পর নিজের শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই কাজ তিনি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৫০ টাকা বেতনের চাকরিটি ছেড়ে দেবার ফলে অক্ষয়কুমার আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হন। তখন তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে তাঁকে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই টাকা তাঁকে বেশিদিন নিতে হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পুস্তক থেকে আয় বাড়তে থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাত ধরে বাংলা ভাষায় গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি সুগঠিত হয়। স্কটল্যান্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও নৃতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কুম্বের রচনার সঙ্গে অক্ষয়কুমার পরিচিত হন। কুম্বের The Constitution of man অবলম্বনে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ১৮৫১ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৩ সালে রচনা করেন। এই গ্রন্থে অক্ষয়কুমার ভারতীয় রীতিনীতির প্রয়োগে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরবৃত্তির সংযোগ বিচার করেছেন। ১৮৫৬ সালে কুয়ের Moral Philosophy অবলম্বনে রচনা করেন 'ধর্মনীতি'। এই গ্রন্থে তিনি জড়জীবন ও ঈশ্বর তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন। অক্ষয়কুমারের মতে ঈশ্বর মানে কোনো অলৌকিক শক্তি নয়। বস্তু জগতের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। উইলসন সাহেবের 'Religious sects of the Hindoos' গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি রচনা করেন 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এর প্রথম খণ্ড ১৮৭০ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩ সালে। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় হিন্দুদের প্রাচীন ও আধুনিক, শ্রদ্ধেয় ও ঘৃণ্য যাবতীয় সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন। এই গবেষণা মূলক গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গ্রন্থটির উপক্রমণিকায় তিনি আর্যভাষা ও সাহিত্যের প্রধান তিনটি শাখা ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো-ইরানীয় এবং বৈদিক ও সংস্কৃত সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেছেন। অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কয়েকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ নিয়ে সংকলন গ্রন্থ 'প্রাচীন হিন্দুদিগের নৌযাত্রা' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে অক্ষয়কুমার প্রাচীন ভারতবর্ষের নৌযাত্রা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের উপস্থাপনা করেন। ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে অক্ষয়কুমার এদেশের তরুণ সমাজের কাছে সহজ সরলভাবে পরিবেশন করেছিলেন। এমনকী স্বকীয়তার জন্য তাঁর অনুবাদও সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছিল। তাঁকে এমন কিছু বিষয় নিয়ে বাংলাভাষায় আলোচনা করতে হয়েছিল যার উপযোগী পরিভাষা তখনও বাংলায় চালু হয়নি। কিন্তু তিনি পিছপা হননি। বিজ্ঞান ও দর্শনের বহু পরিভাষা তিনি নিজেই তৈরি করে নিয়েছিলেন। মূল সংস্কৃত শব্দ থেকে তিনি এই পরিভাষা তৈরি করেছিলেন। ফলে কিছুকিছু শব্দ একটু উদ্ভট শুনতে মনে হয়েছে।

> "তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হয়েও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মীয় মনোভাবের বিরোধিতা করতে পেরেছিলেন। দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন বৈদিক সাহিত্য মানুষের রচিত, সুতরাং তাহা সর্বদাগ্রহণীয় নয়।"

বাংলা গদ্য রচনায় অক্ষয়কুমার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। শব্দ বিন্যাসের দক্ষতায়, বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, বাক্যের নিজস্ব গতি সঞ্চারে অক্ষয়কুমার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। যদিও তাঁর গদ্য রচনায় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তবে বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনায় তাকে বেশ কিছু পরিভাষাগুলি বহুক্ষেত্রেই শ্রুতিমধুর ছিল না। তার উপর নির্বস্তুক বিষয় (abstract) আলোচনার উপযোগী বাংলা গদ্য তখনও চালু হয়নি।

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ। একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের বন্ধুত্ব ও সান্নিধ্য, অন্যদিকে ডিরোজিওর বিজ্ঞানমনস্ক মনোভাব তাকে আপোশহীন সার্থক মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছিল। তাইতো তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হয়েও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মীয় মনোভাবের বিরোধিতা করতে পেরেছিলেন। দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন বৈদিক সাহিত্য মানুষের রচিত, সুতরাং তাহা সর্বদাগ্রহণীয় নয়। কোনো অলৌকিকতায় তাঁর কোনো বিশ্বাস ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযমী। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণ ছিল সাদাসিধে ও বিশুদ্ধ। তিনি সমস্ত রকমের আমিষ খাদ্য পরিত্যাগ করেন। তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তথাপি তিনি কঠোর পরিশ্রম ও সংযমী জীবন থেকে সরে আসেননি। তাইতো তাঁকে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানবাদী সার্থক প্রতীক পুরুষ।

তথ্য সংগ্রহ :

১। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা—সজলকান্তি দাশগুপ্ত।

২। নির্বাচিত জীবনী সমগ্র—নচিকেতা ঘোষ।

এক নির্মম প্রশ্নের মুখোমুখি পশ্চিমবঙ্গ

বিপ্লব বিকাশ

'পুলিশ' শব্দটি সাধারণ মানুষের মনে একটি নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভীক সংস্থার প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে এই ছবিটি কি এখনও বাস্তব? একসময় লোকাল কমিটি (এলসি)-র মেম্বারের কথার উপরে থানার ওসি কথা বলতে পারতেন না। কথা বললেই কমরেডদের সরকার তাকে চেপে ধরত। পুলিশ সবসময় বলে 'আমাদের পদক্ষেপ নিতেই হবে উপর থেকে প্রেশার আছে'। আবার প্রভাবশালীদের ক্ষেত্রে বলে, 'কিছুই করা যাবে না'। বোঝা যায় না কত উপর থেকে প্রেশার আসে? পুলিশ কি আইনের অধীনে কাজ করছে নাকি কোনো প্রেশার কুকারে তাদের চেপে রাখা হয়েছে? এই প্রেশারটা কার বা কাদের, যারা কখনো কিছু করতে বলে আবার কখনো কিছুই করা যাবে না বলে চাপ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই আইন বা জনগণের নয়। আপনি যদি থানা-পুলিশ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সহমত হবেন। মনে হচ্ছে পুলিশ ক্রমশ শাসক দলের লেঠেল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়টি আবারও জনগণের সামনে এসেছে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

সম্প্রতি একটি অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্যপুলিশ হাজার কিলোমিটার দূরে গিয়ে শর্মিষ্ঠা পানোলিকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসে। অথচ একই ইস্যুতে একজন অভিযুক্ত ওয়াজাহাত যে পশ্চিমবঙ্গেই থাকে এবং যার বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ থেকে সরাসরি অভিযোগ ছিল, তাকে কিন্তু স্পর্শই করা হলো না। কেন এই বৈষম্য? ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে পুলিশ কি রাজনৈতিক রং দেখে সিদ্ধান্ত নেয়? এই ঘটনায় পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে মানুষের মনে এক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে।

রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, যারা ইসলামে জন্ম নেননি তারা দুর্ভাগ্যা। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মকে 'গন্দা ধর্ম' বলে মন্তব্য করেন, যা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মকেই অপমান। অপরদিকে তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষ প্রকাশ্যে শিবলিঙ্গের সম্পর্কে কুরুচিকর ছবি পোস্ট করেও কোনোরকম আইনি পদক্ষেপের সম্মুখীন হননি। এরা কি আইন আদালতের ঊর্ধ্বে? ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ালে কিছু মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় আর কিছু মানুষের বিরুদ্ধে হয় না কেন? পুলিশ কি মনে করে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতির কোনো মূল্য নেই?

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন প্রবণতা শুরু হয়েছে। যারা রাস্তা দখল করে, পুলিশের ওপর হামলা করে, তাদের প্রতি পুলিশ নরম মনোভাব দেখায়। বিনা হেলমেটে মাথায় ফেজটুপি পরে মোটরবাইকে তিনজন গেলেও পুলিশ কিছু বলে না, আবার একজন সামান্য নিয়ম ভঙ্গ করলেই দণ্ডিত হন। পুলিশকে জিজ্ঞেস করবেন, এরকম কেন করা হচ্ছে? যারা শান্তিপূর্ণভাবে, আইন মেনে চলেন, তাঁদের জন্য কেন নেই কোনো সম্মান? তাহলে বার্তাটা কী দেওয়া হচ্ছে? অপরাধ করলেই ছাড় পাওয়া যাবে? পুলিশের এই আচরণ সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং তাদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি করছে না কি ? যদি সাধারণ মানুষ যদি পুলিশের সঙ্গে অসহযোগিতার পরিবেশ নির্মাণ করে, তখন সমাজ ব্যবস্থার অবস্থা কী দাঁড়াবে?

কলকাতা হাইকোর্টে সিটের দেওয়া একটি বিশেষ তদন্ত রিপোর্টে মুর্শিদাবাদে জেহাদিদের দ্বারা সংঘটিত হিংসায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, হিংসা, হত্যা ও ঘরবাড়ি জ্বালানোর নেপথ্যে তৃণমূল নেতাদের নাম উঠে এসেছে। তা সত্ত্বেও, পুলিশ কোনো দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। কেন? তারা কি শাসক দলের নেতাদের ভয় পান নাকি জেহাদিদের রক্ষা করাই এখন পুলিশের দায়িত্ব? যেদিন হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল সেদিন পুলিশের নীরব ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় এই প্রশ্নই উঠছে।

তৃণমূলের বিতর্কিত নেতা অনুব্রত মণ্ডল সম্প্রতি এক পুলিশ অফিসারকে ফোনে গালাগালি করলেন। তা সত্ত্বেও, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। বরং যে সংবাদমাধ্যম রিপোর্ট করেছিল, তাদের ধমক দিয়ে চিঠি পাঠানো হলো পুলিশের পক্ষ থেকে। তাহলে গালাগালি করা কি শাসক দলের নেতাদের সাংবিধানিক অধিকারে পরিণত হয়েছে? শাসক দলের নেতা-কর্মীদের এরকম আচরণের বেশ কয়েকটা 'রেকর্ডিং' সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। পুলিশের অবস্থাটা খুবই দুশ্চিন্তাজনক। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুব্রত মণ্ডলের কথাটা শুধু কথার কথা নয়, 'দিদির পুলিশ' আক্ষরিক অর্থেই জনগণের কাছে বাস্তব হয়ে উঠেছে। যেখানেই তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বা দুধেল গাইদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেখানেই পুলিশ নিষ্ক্রিয়। পক্ষান্তরে, সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করলে বা ভিন্নমত প্রকাশ করলে, পুলিশ তখন সক্রিয়।

আজ পশ্চিমবঙ্গবাসীর একটাই প্রশ্ন, এই পুলিশ কি জনগণের পুলিশ নাকি শাসক দলের অনুগত বাহিনী? একজন নাগরিক হিসেবে সকলের প্রত্যাশা থাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রতি, যারা সকলের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করবে। পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে আজ এই বার্তাই প্রতিফলিত, পুলিশ জনগণের নয়, এটি রাজশক্তির হাতে বন্দি এক শাসনযন্ত্র। গণতন্ত্র তখনই পূর্ণতা পায়, যখন আইনের শাসন সবার প্রতি সমানভাবে বর্ষিত হয় এবং তা সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়। আজকের পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন না হয়ে শাসকের আইনের মধ্যে সবাই বাস করছে। অনুব্রত মণ্ডলের পুলিশকে দেওয়া 'দিদির পুলিশ' চিঠি প্রমাণ করছে, এ রাজ্য থেকে 'জনগণের পুলিশ' কবেই উধাও হয়ে গিয়েছে। □

বাংলাদেশের পুতুল সরকার আসলে চাইছে কী?

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

সাম্প্রতিককালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সংঘাত ও সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে একটি 'মানবিক করিডোর' প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তীব্র আলোচনার জন্ম দিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো রাখাইন রাজ্যে আটকে পড়া বেসামরিক নাগরিকদের কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই করিডোর স্থাপনের প্রস্তাব করেছে। বাংলাদেশ সরকার নীতিগতভাবে এ বিষয়ে সম্মতি জানালেও এর ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পর্যবেক্ষক মহল এই করিডোর, বাংলাদেশের বন্দর সুবিধা এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে কেন্দ্র করে দেশের সার্বভৌমত্ব হারানোর গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

প্রস্তাবিত 'মানবিক করিডোর'কে অনেক বিশ্লেষক কেবল মানবিক সহায়তা প্রদানের একটি মাধ্যম হিসেবে দেখছেন না, বরং এর আড়ালে পরাক্রমশালী দেশগুলোর, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার একটি কৌশল হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, আরাকানে তথাকথিত মানবিক সাহায্য পৌঁছানোর নামে করিডোর ব্যবহারের অনুমতি দিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যত পরাক্রমশালী দেশগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে। এই পদক্ষেপকে 'পুতুল সরকার'-এর আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, যা ক্ষমতায় থাকার বিনিময়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ

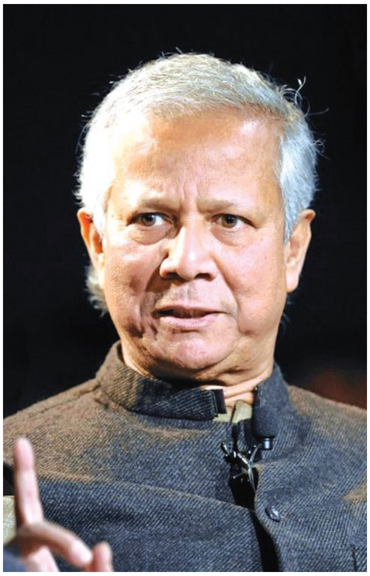

ও কৌশলগত অবস্থান বিদেশি শক্তির হাতে তুলে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর সঙ্গে প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনকে 'বোনাস' হিসেবে দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অভিজ্ঞ মহল প্রশ্ন তুলছে, যদি দেশের স্বাধীনতা এভাবে বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সার্থকতা কোথায়? তাদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে ক্ষমতায় থাকার বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি শক্তি যা চাইবে, তাই দিয়ে দিতে সরকার উৎসাহী।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ফায়ার সার্ভিস রেসকিউ ট্রেনিঙের নামে ইউএস আর্মি এবং ইউএস মেরিনের যৌথ মহড়া চলমান রয়েছে। 'সমুদ্রে আগুন' এই ধরনের মহড়া কেবল একটি মহড়া নয়, বরং এর আড়ালে বাংলাদেশ এখন আগুন নিয়ে খেলছে। এই ধরনের কার্যক্রম দেশের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি বলে বিবেচিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তা ব্যক্তিদের ঢাকা ও চট্টগ্রামের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন এবং এর আকস্মিক কারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ করা হচ্ছে যে, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত কার্যকর না হয়ে উলটে আরও রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটছে, যা একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রক্রিয়ার অংশ। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো বাংলাদেশে তাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করছে।

মানবিক করিডোর নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সরকারের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী চাইছে একটি নির্বাচিত সরকার ছাড়া এমন সিদ্ধান্ত বিধিসম্মত নয়। তাদের মতে, সংসদীয় পন্থা ছাড়া এমন কিছু করা অস্থায়ী সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যকরী সংসদ বা সরকার না থাকায়, সবাই নিজেদের অবস্থান তৈরি এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের কাজে ব্যস্ত। ফলে ন্যায়-অন্যায় বিচার করার কোনো কার্যকর কর্তৃপক্ষ এখন বাংলাদেশে দৃশ্যমান নয়।

১৯৭৩ সালে সেন্ট মার্টিন নিয়ে আমেরিকা প্রথমে প্রস্তাব এবং পরে রক্তচক্ষু দেখিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই একই চেষ্টা নতুন রূপে ফিরে আসছে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে। বিপরীত দিকে, আরেক শক্তি চীন এই বিষয়ে মুখে কুলুপ লাগিয়ে বসে আছে। তারা ভারতকে অস্থির করা যায় এমন যেকোনো পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়ে চলেছে। □

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে অপপ্রচার থেকে বিরত থাকুন রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা

বিশ্বপ্রিয় দাস

ভারতের অহংকার আজ অপারেশন সিঁদুর। সেই অপারেশন সিঁদুরকে নিয়ে রাজ্যে সরকারের কটাক্ষ, বিরূপ আচার-আচরণ, দেশ বিরোধী মনোভাব কি সঠিক? কথাটা বলার কারণ একটাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী থেকে নেতা সবাই আজ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নানা রকম কটূক্তি করেই চলেছেন। যেমন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রীকে সিঁদুর বিক্রেতার নামে ডাকছেন, তখন আরেক মন্ত্রী পাকিস্তানের সঙ্গে নিয়ে এলেন নতুন তথ্য, দেশের প্রধানমন্ত্রী নাকি পাকিস্তানের সঙ্গে সেটিং করে অপারেশন সিঁদুর করেছেন। রাজ্য সরকারের অনেক নেতা-মন্ত্রী এসব কথা বলছেন। তাহলে এদের জাতীয়তাবোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না কেন?

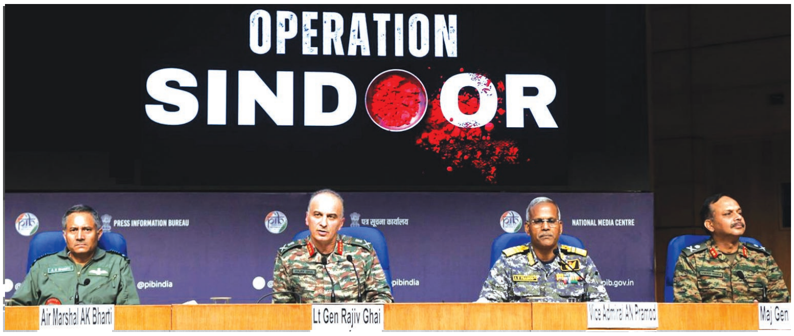

পহেলগাঁওয়ে হিন্দু পর্যটকদের বেছে বেছে হত্যা করা হলো, সেটি তাহলে মেনে নিচ্ছেন রাজ্যে সরকারের মিনি পাকিস্তান তত্ত্বের প্রবক্তা মন্ত্রী মশাই থেকে অন্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা। একই কায়দায় মুর্শিদাবাদ, মালদার ঘটনা ঘটেছে। সেখানেও কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিল। রাজ্য প্রশাসনের তরফে যখন পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছিল না বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টার অভাব দেখা দিয়েছিল, সেই সময়ে আদালতের নির্দেশে সেনা নেমে পুরোপুরি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। সেখানে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য রাজ্য শাসকদলের এই সেটিং তত্ত্ব। আবার হয়তো সেই সীমান্ত অঞ্চলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে বিএসএফের ঢিল ছোঁড়ার জন্য তুলে দেওয়ার জন্য অভিযোগ উঠতে পারে। রাজ্য সরকার রাজনীতি করুন। কিন্তু এই ধরনের জাতীয়তাবোধের আবেগে আঘাত হানার মতো মানসিকতা দেখাবেন না। সারা ভারত আজ অপারেশন সিঁদুরের জন্য পদযাত্রা, মিছিল করে বীর সেনানীদের সম্মান জানাচ্ছেন। আর আপনারা সেই বীর সেনাদের কালিমা লেপন করে অশ্রদ্ধার পথ বেছে নিচ্ছেন। ধিক্কার জানাবার ভাষা নেই আপনাদের প্রতি। ধর্ম ও জাতি নিয়ে দুমুখো রাজনীতি রাজ্য সরকার করছে, আর এখন প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটব্যাংকের জন্য যতটা নীচে নামতে হয় নামছে, সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করছে। একটু লক্ষ্য করেছেন কি সংখ্যালঘু জনগণ, কেন্দ্রীয় সরকার আপনাদের জন্য আলাদা কোনো আইন বা নিয়ম সুবিধা এনেছে, যেটা আপনাদের স্বার্থের বিপক্ষে। একটি শব্দ উচ্চারণ করেননি আপনারা। এমনকী যেখানে ওয়াইসির মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থন করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। সারা বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ নির্মূলীকরণে শপথ গ্রহণ করছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। সেখানে কূপমণ্ডুক রাজ্য সরকারের মন্ত্রী থেকে নেতারা সেটিঙের রাজনীতি খুঁজছেন, আবার তা ফলাও করে প্রকাশ্য জনসভায় বলছেন। ভাবছেন সাধারণ মানুষ খুব খাচ্ছে কথাটা। কিন্তু তারা মনে মনে হাসছে।

রাজ্য সরকারের নেতা ও মন্ত্রীরা বলুনতো কোন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আপনারা এই সেটিঙের কথাটা আনলেন। অবশ্যই আপনাদের হাতে চাকরি চুরি, কয়লা চুরি সমেত নানা ছিঁচকে চুরির মতো পুলিশের মাধ্যমে তথ্য প্রমাণ লোপাটের ইতিহাস আছে। সেখানে এই আন্তর্জাতিক বিষয়ে এই তত্ত্ব আপনাদের একবারও ভাবাল না যে একটি দেশ যখন অন্য দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে প্রত্যাঘাত করে, সেখানে তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতটা কৈফিয়ত দিতে হয়? এটা বোধহয় ওই সব কূপমণ্ডুক মন্ত্রী থেকে মুখপাত্ররা জানেন না যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত আজ কতটা শক্তিশালী, অপারেশন সিঁদুরের পর শত্রু দেশগুলি কি ভারতকে ছেড়ে কথা বলত? এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, কানাডায় যে জি-৭ বৈঠক হচ্ছে, সেখানে প্রতিবারের মতো এবারেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। বিরোধিতা ছিল তবুও ভারতকে উপেক্ষা করতে পারেনি আয়োজক দেশ কানাডা। কানাডার প্রধানমন্ত্রী নিজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে যখন ভারতের সর্বদলীয় সাংসদদের দল গিয়েছে, অপারেশন সিঁদুরের পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করেছেন, কোনো দেশ কি ভারতের বিরোধিতা করে কোনো বিবৃতি দিয়েছে? বরং এই বিষয়টিকে সমর্থন করে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করে সারা বিশ্বকে এক হবার ডাক দিয়ে ভারতের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

রাজনীতি করা ভালো। কুয়োর ব্যাঙের মতো বাইরের পৃথিবীকে না দেখে, না জেনে, হয়তো-বা সাংবাদিক কুলশিরোমণি মুখপাত্রের মতো বা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী হয়েও, জেনেও না জানার ভান করে সব বিষয়ে বলার মতো, বিশেষ করে অপারেশন সিঁদুরের মতো গর্বের বিষয়টিকে নিয়ে অপপ্রচার করার ক্ষমতা তাঁদের নিশ্চয়ই কেউ দেয়নি। আবার বলা দরকার, নোংরা রাজনীতির খেলায় অপনারেশন সিঁদুরের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টিকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন দেশবিরোধীরা। তাদের এই মনোভাবের জন্য মানুষ তৈরি হচ্ছেন উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য। □

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ভারতের বাস্তবসম্মত কৌশল

ড. নন্দিনী বশিষ্ঠ

তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে ইউক্রেন ও রাশিয়া আবারও 'নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি' নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে উভয় পক্ষ ১২ হাজার সৈন্যের মৃতদেহ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আলোচনা শুরু হওয়ার আগেও প্রত্যাশা কম ছিল, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় আক্রমণ শুরু করার পর থেকে চলমান যুদ্ধের অবসান কীভাবে করা যায় তা নিয়ে উভয় পক্ষই গভীরভাবে বিভক্ত ছিল। এই 'জটিল আন্তঃনির্ভরশীল' বিশ্ব কাঠামোতে সমস্ত বৃহৎ শক্তি এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িত যেখানে ভারত অত্যন্ত সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করে।

যুদ্ধের শুরু থেকেই রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেন রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কথা বলেছেন; দু'পক্ষের প্রতি শান্তি ও সংযমের আহ্বান জানিয়েছেন। এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে পুতিনের কাছে তাঁর ২০২২ সালের বিবৃতি, 'এটি যুদ্ধের যুগ নয়' বিশ্বব্যাপী প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং এমনকী আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনেও উদ্ধৃত করা হয়েছিল, যা ভারতের নরম-শক্তি কূটনীতি বা 'সফট্ পাওয়ার'-এর প্রতিফলন ঘটায়। ভারতের অবস্থান নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন নয় বরং অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। কারণ ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর বার বার জোর দিয়েছেন যে কীভাব ভারতের সিদ্ধান্তগুলি তার জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়, আন্তর্জাতিক চাপ দ্বারা নয়। এটি একটি ভারতের স্বাধীন বিদেশনীতিগত পরম্পরার প্রতিফলন যা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন থেকে অব্যাহত রয়েছে, এবং এখন এটি একবিংশ শতাব্দীর বহুমেরু বিশ্বে ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে।

ভারতের চ্যালেঞ্জ হলো পশ্চিমি বিশ্ব, বিশেষ করে রাশিয়ার সঙ্গে তার ঐতিহাসিক সম্পর্ক রক্ষার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অংশদারিত্বের ভারসাম্য বজায় রাখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কোয়াড জোটের সদস্য হিসেবে, ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমানে অন্যতম সহায়ক শক্তি হলো ভারত। তবুও, ইউক্রেনের ক্ষেত্রে নয়াদিল্লি একটি জোটনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখেছে, যা শীতল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লির দ্বারা গৃহীত পররাষ্ট্রনীতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভারতের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিণতিগুলির মধ্যে একটি হলো রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বৃদ্ধি। পশ্চিমি শক্তিগুলি রাশিয়ার জ্বালানি রপ্তানির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সঙ্গে সঙ্গে, ভারত প্রচুর পরিমাণে রাশিয়ান কাঁচাতেল আমদানি অব্যাহত রেখেছে, যা ভারতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক। তাছাড়া, রাশিয়া ভারতের অন্যতম বৃহত্তম অস্ত্র সরবরাহকারী এবং মহাকাশ, পারমাণবিক শক্তি ও বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। নয়াদিল্লি যুক্তি দিয়েছে যে এই ক্রয়গুলি কোনো নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে না এবং 'বিকশিত ভারত'-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইউক্রেন সফর করেন এবং কৃষি, চিকিৎসা, সংস্কৃতি এবং মানবিক সহায়তা সহযোগিতা প্রদানের জন্য চারটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা সরবরাহ এবং দুর্যোগ ত্রাণ। এটি 'অপারেশন গঙ্গা'-র অধীনে যুদ্ধের প্রাথমিক দিনগুলিতে হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক, যাদের বেশিরভাগই ছাত্র, ইউক্রেন থেকে সরিয়ে নেওয়ার সুবিধা প্রদান করে। ভারত একাধিকবার অসামরিক পরিকাঠামোর সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে, যা শান্তিকামী গণতন্ত্র হিসেবে তার ভাবমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ এবং চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে, ভারত বর্তমানে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করছে। পশ্চিমি শক্তির দ্বারা গৃহীত পররাষ্ট্রনীতির বিপ্রতীপে, তাদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও ভারতের সাফল্য রীতিমতো নজরকাড়া।

সুতরাং, কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে, যখন বহুমেরু রাজনীতি দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে, তখন ভারতের অবস্থান অন্যান দেশগুলির জন্য একটি মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে যারা বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার জটিল ভূ-রাজনীতিতে সহাবস্থান করছে। এই পদ্ধতি ভারতের আন্তর্জাতিক প্রভাবকে শক্তিশালী করে নাকি সীমিত করে তা এখনো দেখার বিষয়— তবে আপাতত, নয়াদিল্লি নীতিগত, বাস্তববাদী এবং জোটনিরপেক্ষ পথেই রয়েছে। ভারত ধারাবাহিকভাবে কূটনীতি ও আলোচনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছে, স্পষ্টভাবে কোনো পক্ষের নাম বা দোষারোপ না করে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার উপর জোর দিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ব্যবস্থা একটু সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। এটি কোয়াড এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মতো উদ্যোগের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করে চলেছে। একই সঙ্গে, এটি রাশিয়ার সঙ্গেও একটি শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাশিয়া হলো ভারতের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষা অংশীদার এবং ইউরেশিয়ান নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

সুতরাং, মূলকথা হলো, ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাতে ভারতের ভূমিকা মধ্যস্থতাকারীর। এই কৌশলগত দিকটিতে ভারতের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক শক্তি হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ভারতের কূটনৈতিক প্রয়াসের প্রতিফলন। বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ এবং চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে, ভারত বর্তমানে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করছে। পশ্চিমি শক্তির দ্বারা গৃহীত পররাষ্ট্রনীতির বিপ্রতীপে, তাদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও ভারতের সাফল্য রীতিমতো নজরকাড়া। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

বিপ্লবী কার্য

(২৪)

ডাঃ কেশবরাও এতদিন নানাভাবে বিপ্লবী কার্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু এবার তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন বৈপ্লবিক সংগঠন কার্যে। নাগপুর, বিদর্ভ অঞ্চল থেকে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছিল তাঁর কাজের সীমানা। তবে যোগাযোগ ও গুপ্তকার্য সম্পর্ক ছিল পঞ্জাব, রাজস্থান মধ্যপ্রান্ত থেকে শুরু করে গোয়া, পণ্ডিচেরি পর্যন্ত এবং বঙ্গপ্রদেশ তো আগে থেকেই বিপ্লব চেতনার কর্মভূমি। তাঁর এই বিপ্লবী কাজের মধ্যে মুখ্য ছিল— ১) বিভিন্ন অঞ্চলে ও গ্রামে গিয়ে স্বাধীনতার বার্তা দিয়ে সংগঠন তৈরি করা, ২) অর্থ সংগ্রহ, ৩) বৈপ্লবিক কাজের জন্য পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্বস্ত তরুণদের সংগ্রহ করা, ৪) অস্ত্র ক্রয় বা সংগ্রহ, ৫) বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র প্রেরণ, ৬) পুরাতন অস্ত্রের মেরামতি, ৭) বন্দুক চালানোর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

এই সমস্ত কাজে তাঁর সঙ্গী ছিলেন ভাউজী কাওরে। তিনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করতেন, বড়ো সাদা সিধে মানুষ। বলিষ্ঠ দেহ, তেজোদীপ্ত দৃষ্টি, বিরাট গোঁফজোড়া নিয়ে তিনি ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষ। স্ত্রী গত হলেন আর তিনি নিজেকে সমর্পিত করলেন দেশের কাজে। তার স্মৃতিচারণা করতে করতে তার এক বন্ধু বলেছিলেন, 'ভাউজীর ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে তাকে মা বলি কিংবা বাবা বলি, ভাই বলি না বন্ধু বলি একথা বুঝতে পারতাম না।' বলতে বলতে অশ্রুসজল হয়ে উঠত তাঁর দু'চোখ। এমন অন্তর ও অন্তর্শক্তিসম্পন্ন মানুষটির সঙ্গে ডাঃ কেশবরাওয়ের ছিল খুব গভীর সম্পর্ক।

পরবর্তীতে তাঁর অন্যতম সহযোগী হলেন ওয়ার্ধার হরিকৃষ্ণ জোশী, যিনি আপ্পাজী নামেই সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। ইতিমধ্যে বিপ্লবী দলে নতুন নতুন তরুণদের ভর্তির জন্য আন্না খোত 'নাগপুর ব্যায়ামশালা' তৈরি করেন। একই উদ্দেশ্যে নাগপুর, ওয়ার্ধা-সহ বিভিন্ন স্থানে পাঠাগারও শুরু করা হয়। নানা পদ্ধতি অবলম্বন করতেন বলে বাইরে থেকে এই বিপ্লবের কর্মকাণ্ডকে কেউ বুঝতেই পারত না। হঠাৎ দেখা গেল এক গ্রামে অনেকে জড়ো হয়েছে বনভোজন করতে, তখন বলা হতো মিষ্টান্ন ভোজন। আসলে নানা পর্যায়ের বৈপ্লবিক কার্য সম্পর্কিত লোকজন সেখানে জড়ো হতো। সব যোজনা করতেন ডাঃ হেডগেওয়ার এবং ভাউজী কাওরে। সারাদিন হইচই, আলোচনা, এমনকী অর্থসংগ্রহ করার যোজনাও ছিল। এইসব বৈঠকে টাকাপয়সাও সংগ্রহ হতো। আর তা ব্যবহার করা হতো অস্ত্রশস্ত্র কেনার কাজে।

নিয়োগ পরীক্ষা

তরুণরা বৈপ্লবিক কাজের কতটা উপযুক্ত তা নানাভাবে পরীক্ষা করে তবেই দলে যুক্ত করা হতো। একবার ভাউজী কাওরে তিনজন তরুণকে নিয়ে নাগপুর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে ইন্দোরা গ্রামে বাঁজা ভোঁসলের কুয়োর কাছে গেলেন। এখানকার সব কুয়ো বিশালাকার। ওঠা-নামার জন্য গায়ে রিং বসানো থাকে। এমন একটি কুয়োয় ওই তিনজনকে ঝাঁপ দিতে বললেন। গভীর কুয়োর দিকে তাকিয়ে দুজন পিছিয়ে গেল। কিন্তু একজন সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়োর মধ্যে। এই তরুণ ছিলেন বাবুরাও হরকরে। বাবুরাওয়ের পেছনে ভাউজীও কুয়োতে ঝাঁপ দিলেন, তুলে আনলেন বাবুরাওকে। তাকে দেওয়া হলো বিপ্লবী দলের সদস্যপদ।

অস্ত্র সংগ্রহ

বিপ্লবী দলে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো অস্ত্র জোগাড় করে, তা সঠিক জায়গায় পৌঁছানো। কিন্তু এই কঠিন কাজেই ডাঃ কেশবরাও ও ভাওজী কাওরের দক্ষতা, নির্ভীকতা ও নিপুণতা ছিল লক্ষণীয়। দুঃসাহসিক হলেও কামঠীর সৈন্য শিবিরে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করে অস্ত্র কেনার কাজ করা হয়েছিল। একবার নাগপুর থেকে সরকারি গোলা বারুদের বাক্স যখন মালগাড়িতে তোলা হচ্ছিল, তখন কয়েকজন বিপ্লবীকে সৈনিকের পোশাক পরিয়ে তাদের সেনাদলে মিশিয়ে দেওয়া হলো এবং পরিকল্পনা মতো কয়েকটি গোলাবারুদের বাক্স গাড়ি থেকে নামিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি পুলিশের গোয়েন্দারা যাতে আঁচ না পায় তার জন্য ডাক্তারজী সৈনিকের পোশাকগুলি পুড়িয়ে তার ছাই নর্দমার জলে ভাসিয়ে দেন।

বিদেশি অস্ত্র

এত সদস্য সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ এবং অস্ত্র সংগ্রহের পেছনে একটা বড়ো বিদ্রোহের বা যুদ্ধের পরিকল্পনা ছিল। প্রকাশ্যে আসার সুযোগ না পেলেও পঞ্জাব থেকে নাগপুর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। ইয়তমলের বামনরাও ধর্মাধিকারী একবার জানিয়েছিলেন যে, '১৯১৭-১৮ সালের কাছাকাছি সময়ে ডাক্তারজী বিদ্রোহের কথা আমাদের কর্ণগোচর করেছিলেন।' ১৯১৮ সালে ডাক্তারজী তাকে মর্মাগোয়া পাঠিয়ে বলেছিলেন, সংকেত অনুযায়ী একটি জাহাজ ওখানে আসবে এবং জাহাজ আসার সঙ্গে সঙ্গে কাজ হবে নাগপুরে এসে খবর দেওয়া। যথেষ্ট টাকাও তাকে দেওয়া হয়েছিল, বম্বে থেকে সমুদ্রপথে তিনি গোয়া গেলেন। সাঁতারার শ্রী প্যাটেলের সঙ্গে কাজটি করার কথা ছিল, কিন্তু দেখা গেল, সে জাহাজ পৌঁছাল না। জানা গেল মাঝপথেই ইংরাজরা একটি জাহাজ আটক করেছে। খবর দেওয়া হলো নাগপুরে। পরবর্তীতে শ্রী বামনরাওকে দিয়ে গোয়া থেকে ডাক্তারজী কিছু পিস্তল আনালেন। বিশ্বযুদ্ধের পরিদৃশ্যে বিপ্লবের নানা কর্মকাণ্ডে এভাবেই ডাক্তারজী হয়ে উঠলেন এক অন্যতম বিপ্লবী নেতা।

(সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস)